পরমারাধ্য
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

শুভ উদ্বোধন

শনিবার ১৯শে মার্চ, ১৯৬০, সন্ধ্যা ৬॥০টায়

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ শ্রীগুরু লাইব্রেরী ॥

॥ ক লি কা তা : ছ য় ॥

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ

পুরুষ

শ্রীরামকৃষ্ণ—গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য
রামকুমার—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
রামেশ্বর—শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ)
হৃদয়—অনুপকুমার
হলধারী—প্রেমাংশু বোস
মথুর—কমল মিত্র
গিরিশচন্দ্র—ছবি বিশ্বাস
নরেন্দ্রনাথ—আশীষকুমার
মহেন্দ্র মাষ্টার—তুলসী চক্রবর্ত্তী
রাম দত্ত—মণি মজুমদার (এ্যাঃ)
যোগীন—অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য (এ্যাঃ)
দেবেন—পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
সুরেন—গোপাল দে
ভবনাথ—অরুণ রায়
রাখাল—পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য (এ্যাঃ)
তোতাপুরী—চন্দ্রশেখর
লাটু—শান্তিগোপাল
মহেশ—শৈলেন মুখোপাধ্যায়
শঙ্কর গোঁসাই—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘনশ্যাম—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
গজানন গড়গড়ি—শ্যাম লাহা
গণেশ ভট্টাচার্য্য—প্রীতি মজুমদার
হরি চৌকিদার—শান্তি দাশগুপ্ত
জনৈক ভক্ত—মাঃ সুখেন
বামনদাস—শৈলেন ভট্টাচার্য্য

জনৈক বৃদ্ধ—৺নকুল দত্ত পরে—কানু চক্রবর্ত্তী

বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ—পতাকী মুখোপাধ্যায়, করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায়—বিষ্ণু সেন, অজয় সিংহ, মণি শেঠ, বিশ্বনাথ, রামকৃষ্ণ, কার্ত্তিক মিত্র, দিলীপ রায়, রাম ভট্টাচার্য্য, অলক দাশগুপ্ত ও সুশীল বোস।

স্ত্রী

রাসমণি—অপর্ণা দেবী
সারদামণি—কৃষ্ণা ঘোষ
পদ্মমণি—প্রিয়া চ্যাটার্জি
জগদম্বা—গীতা দে
ভৈরবী—সাধনা রায় চৌধুরী
চন্দ্রমণি—শৈলবালা
মেজবৌ—প্রভাবতী জানা
সুকুমারী—ভারতী

অন্যান্য ভূমিকায়—সূর্য্যা মিত্র, মঞ্জু ব্যানার্জি, মানসী সরকার ও কৃষ্ণা বোস

স্মারক ঃ

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীসত্য সরকার

যন্ত্রী সঙ্ঘ ঃ

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বিশ্বনাথ কুণ্ডু	,, মুরারী রায় চৌধুরী
,, জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,, শচীন বসু
,, ফণী বন্দ্যোপাধ্যায়	,, পরেশ বসাক

শব্দ ক্ষেপণ ঃ

শ্রীদুলাল মল্লিক | শ্রীঅজিত মৈত্র

আলোক সম্পাতে ঃ

শ্রীঅজিত সাহা	শ্রীভানু মুখোপাধ্যায়
,, বৈদ্যনাথ সেন	,, বঙ্কিমচন্দ্র দাস
,, জলধর নান	,, কানাইলাল ধর
,, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ	,, মণীন্দ্রনাথ দে

মঞ্চমায়াকর ঃ

শ্রীঅনিলকুমার দাস	শ্রীভগীরথ . মিস্ত্রী
,, ভূষণ সামন্ত	,, বিজয় চিত্রকর
,, বলাই অধিকারী	,, যুগল গুঁই
,, কার্ত্তিক কর্ম্মকার	,, মণীন্দ্রনাথ দাস
,, রামদাস দাস	,, রামপদ চিত্রকর
,, সন্তোষ সরকার	,, শশিভূষণ দাস

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্য্যন্ত এই নাটকের বিষয়বস্তু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রতিটি দিন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং প্রতিটি দিনের ঘটনা কোন না কোন কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর সমগ্র জীবন-কাহিনী একটি নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে, এই নাটক গড়ে উঠেছে। নাটকের প্রয়োজনে আগের ঘটনা পরে ও পরের ঘটনা আগে নিয়ে যেতে হয়েছে। ঠাকুরের মাতৃ-বিয়োগ ও মাতৃ-তর্পণের কাহিনী নাটকের প্রয়োজনে আমায় মাষ্টার মশায়ের মুখ দিয়ে বলাতে হয়েছে। ঠাকুরের মাতৃ-তর্পণের কাহিনী, মাষ্টার মশায়ের ঠাকুরের অনুগ্রহলাভের বহু পূর্ব্বের ঘটনা। নাটক রচনাকালে বিভিন্ন গ্রন্থকারের জীবন-কাহিনীর সাহায্য আমায় নিতে হয়েছে। তাঁদের সকলকে এবং 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' রচয়িতা খ্যাতিমান্ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি— ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬৭।

বিনীত

দেবনারায়ণ গুপ্ত

সংগঠনে ঃ

প্রযোজনা ঃ শ্রীসলিলকুমার মিত্র, সত্ত্বাধিকারী, ষ্টার থিয়েটার

রচনা ও পরিচালনা ঃ শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্য সজ্জা ও আলোক সম্পাত ঃ শ্রীঅনিল বসু

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ শ্রীঅনিল বাগচী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর ১২৬২ সাল, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ। স্নানযাত্রার শুভদিন। দক্ষিণেশ্বরের নবনির্ম্মিত মন্দির পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত। রাণী রাসমণির তক্‌মাধারী দারোয়ান ও আঁটাশোঁটাধারী দেহরক্ষীরা ব্যস্তভাবে ঘোরা-ফেরা করিতেছে। এই নবনির্ম্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসবে আজ বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। বহু দীন দুঃখীরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সাধু, সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবদেরও এই ভীড়ের মাঝে দেখা যায়। সাড়ম্বর সমারোহে প্রতিষ্ঠার ঘটা। প্রতিটি মন্দিরের বেদীতে বিগ্রহের মূর্ত্তি আনিয়া বসান হইয়াছে। রাণী রাসমণি, মথুর, রাসমণির কন্যারা এবং রাণী রাসমণির সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত ব্যবস্থার তদারক করিতেছেন। ইতস্ততঃ লোকজন চলাফেরা করিতেছে। ইহারই মাঝে হৃদয় রামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় ও ডাকে :]

হৃদয়॥ মামা—মামা—

[রামকৃষ্ণ ব্যস্তভাবে কাছে আসিয়া বলেন]

রামকৃষ্ণ॥ আরে, হৃদু ? তুই ? তুই কোথা থেকে এলি ?

হৃদয়॥ গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে এসে পড়লাম মামা।

রামকৃষ্ণ॥ বেশ করেছিস্। এতবড় একটা ঠাকুর প্রতিষ্ঠার উৎসব না দেখ্‌লে আপশোষ থেকে যেত। যাক্, তোদের সিয়রের মহেশ চাটুয্যে

কিন্তু একটা কাজের মত কাজ করেছে। তবু তো যা হোক, তোদের গাঁয়ের দু'চারজন বামুনকে এনে মন্দিরের কাজে ঢোকালো—

হৃদয় ॥ তা যা বলেছ মামা। বড় মামা কোথায় ?

রামকৃষ্ণ ॥ এই কাছেপিঠেই কোথাও আছেন।

হৃদয়। শুনছিলাম, বড় মামাই নাকি পাঁতি দিয়েছেন বলে মন্দির প্রতিষ্ঠা হোল।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ। কিন্তু জানিস হৃদু, লোকে এই নিয়ে কত কথাই না বলছে—

হৃদয় ॥ তাই নাকি ?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ। বলছে—দাদা নাকি টাকা খেয়ে পাঁতি দিয়েছে—

হৃদয় ॥ টাকা খেয়ে পাঁতি দেল বড় মামা ?

রামকৃষ্ণ ॥ সে না হয় তুই বল্লি, লোকে তো আর তা বুঝছে না।

হৃদয় ॥ না বুঝলো, বয়েই গেল! তা যাক্—রাণী ঠাকুর প্রতিষ্ঠার কি আয়োজনটা করেছেন বলো দিকি ?

রামকৃষ্ণ ॥ একেবারে হস্তিনার রাজসূয় যজ্ঞ রে!

হৃদয় ॥ যা বলেছ।

[রামকৃষ্ণ ও হৃদয়ের কথার মাঝে রামকুমার সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন]

রামকুমার ॥ এই যে গদাই! তোকে আমি চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—

রামকৃষ্ণ ॥ কেনে গো!

রামকুমার ॥ ভাবলাম এত লোকের ভীড়ের মাঝে কোথায় বুঝি হারিয়ে গেলি!

[রামকুমার হৃদয়কে লক্ষ্য করেন না। ইতিমধ্যে হৃদয় রামকুমারকে প্রণাম করে। রামকুমার বলেন]

রামকুমার ॥ আরে হৃদু যে! তুই ? তুই কোথা থেকে এলি ?

হৃদয় ॥ সিয়রের লোকেদের সঙ্গে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা দেখতে এলাম।

রামকুমার ॥ বেশ করেছিস! তা উঠেছিস কোথায়?

হৃদয় ॥ উপস্থিত মন্দিরেই এসেছি।

রামকুমার ॥ চল্—আমার কাছেই থাকবি।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চল্ হৃদে, বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে।

[ইতিমধ্যে মহেশ চাটুয্যে হন্তদন্ত হইয়া সেখানে আসিয়া হাজির হন]

মহেশ ॥ তোমরা এখানে? আর আমি তোমাদের চতুর্দ্দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি দাদা!

রামকুমার ॥ খুঁজে বেড়াচ্ছ? কেন মহেশ?

মহেশ ॥ সব পণ্ড হবার যোগাড় হয়েছে! তুমি একবার এস দাদা।

রামকৃষ্ণ ॥ পণ্ড ত হবেই। আসর সাজাতে সাজাতেই যে রাত কাবার করলে গো! যাত্রা বসাবে কখন?

রামকুমার ॥ তুই থাম্ গদাই। মহেশ কি বলে শুনতে দে। কি ব্যাপার মহেশ?

মহেশ ॥ ভৈরব ভট্‌চায্যিকে পূজারী ঠিক করা হয়েছিল। সে-ই পূজো করবে সব ঠিকঠাক। কি জানি কি হোল, হঠাৎ পূজো করতে পারবো না বলে চলে গেল!

রামকুমার ॥ সে কি!

মহেশ ॥ হ্যাঁ। ভৈরব ভট্‌চায্যিকে আমিই বড়মুখ করে এনেছিলাম, এখন আমিই ফাঁপড়ে পড়ে গেছি, মনিবের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না।

রামকৃষ্ণ ॥ কেনে গো! মুখ পুড়লো ত ভৈরবের। কথা দিয়ে রাখলো নি। তাতে তোমার লজ্জা কিসের?

মহেশ ॥ তুমি একবারটি এস দাদা! দয়া করে একটা উপায় করে দাও—

রামকুমার ॥ কিন্তু আমি গিয়ে কি করবো মহেশ ?

মহেশ ॥ রাণী মা, সেজবাবু ওঁরা সব ওখানে মুখ চূণ করে বসে আছেন, তুমি গিয়ে একটা পথ বাত্‌লে দাও দাদা !

রামকুমার ॥ (চিন্তা করিয়া) বেশ। চলো—(রামকৃষ্ণের প্রতি) তোরা কাছেপিঠেই থাকিস্ গদাই—আমি আসছি—

[রামকুমার ও মহেশ প্রস্থানোদ্যত। সহসা রাসমণি ও মথুরবাবুকে সে দিকে আসিতে দেখা গেল। পিছনে পাইক বরকন্দাজ]

মহেশ ॥ ঐ যে! হন্তদন্ত হয়ে রাণীমা আর সেজবাবু এদিকেই আসছেন।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে হৃদে, চল্ পালাই—

হৃদয় ॥ কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ্‌ছিস্ না ঐশ্বর্য্যের ঢেউ তুলে আসছে—চল্—চল্—

[রামকৃষ্ণ হৃদয়ের হাত ধরিয়া এক প্রকার জোর করিয়া লইয়া গেলেন। মহেশ বিস্মিতভাবে সেই দিকে চাহিয়া থাকেন। ইতিমধ্যে রাসমণি ও মথুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। রাসমণি গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকুমারকে প্রণাম করেন। রামকুমার হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে রাসমণি বলেন]

রাসমণি ॥ বাবা ! আপনি ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। আপনার ভরসা পেয়ে প্রতিমা সাজিয়েছি—কিন্তু বোধন বস্‌বে না কি ?

মথুর ॥ এ সঙ্কটে আপনি ব্যবস্থা না দিলে ত সব উৎসাহ আয়োজন পণ্ড হয়ে যায় !

মহেশ ॥ যা হোক একটা ব্যবস্থা কর দাদা—

রাসমণি ॥ আমি দীর্ঘ দশ বছর কাল ধরে হৃদয়-মন্দিরে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলাম—যে মাতৃ-মূর্ত্তির বন্দনা করলাম, তার প্রতিষ্ঠা হবে না বাবা ?

মহেশ ॥ রক্ষা কর দাদা, পাঁতি দিয়েছিলে তুমি—এখন তুমিই এর একটা উপায় করে দাও—

রামকুমার ॥ আপনি ভাববেন না মা—ভাল কাজের বহু বিঘ্ন। যাঁর নির্দ্দেশে এমন এক মহৎ কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাঁর পূজা কখনও ব্যর্থ হবে না—ভৈরব পূজো না করে, কোন বাউনে যদি পূজো না করে, তা হ'লে আমিই পূজো করবো মা।

রাসমণি ॥ আর কোন ব্রাহ্মণকেই আমি অনুরোধ করবো না বাবা, আপনিই মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করুন।

রামকুমার ॥ বেশ—তাই হবে মা! মহেশ, পূজোর সব আয়োজন করা হয়েছে কি ?

মহেশ ॥ আজ্ঞে হাঁ।

রাসমণি ॥ আঃ—বাঁচলুম। বড় অশান্তিতেই এতক্ষণ কেটেছে—। মথুর, ভট্টচায্যি মশায় যে ভাবে যা করতে বলেন, নিজে থেকে তার ব্যবস্থা করো—আর ওঁর প্রণামী, পারিশ্রমিক, যা উনি চাইবেন—

রামকুমার ॥ (বাধা দিয়া) প্রণামী পারিশ্রমিক কিছুই আমি নিতে পারবো না মা!

রাসমণি ॥ (সঙ্কিতভাবে) বাবা!

রামকুমার ॥ কিছু মনে করবেন না মা—অব্রাহ্মণের দান আমার বাবাও কখনও নেন নি, আমিও নিই না। পূজোর বিনিময়ে মাইনে নিলে, পূজো হয় না—এ কথা আমি আমার বাবার কাছে বহুবার শুনেছি। বাবা কখনও প্রণামী পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নি—আমিও করবো না—

তবে যতদিন না আপনি উপযুক্ত পূজারী পান, ততদিন আমিই মায়ের পূজা করবো।

রাসমণি ॥ যাক্, নিশ্চিন্ত হোলাম।

মথুর ॥ কিন্তু প্রণামী নিতে দোষ কি ?

রাসমণি ॥ সত্যি—প্রণামী নিতে দোষ কি বাবা ? প্রণামী তো বেতন নয়, পারিশ্রমিক নয়—দানও নয়। ভক্তেরা ঠাকুরের পায়ে যে অঞ্জলি দেন, সেই তো প্রণামী। তা নিতে বাধা কি বাবা ?

রামকুমার ॥ প্রণামী মায়ের সম্পত্তি—মার পূজা-অর্চ্চনায় তা ব্যয়িত হবে—কি নিচ্ছি, আর কি নেবো না, তার জন্যে আপনার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই মা—তবে পূজোর ভার যখন গ্রহণ কোরলাম, তখন পূজো আমি করবো—চল মহেশ—

[রামকুমার মহেশের সহিত মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাসমণি ও মথুর তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। অপর দিক দিয়া অতি সন্তর্পণে রামকৃষ্ণ সেখানে ফিরিয়া আসেন এবং হাতছানি দিয়া হৃদয়কে ডাকেন। হৃদয় রামকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলে]

হৃদয় ॥ কি হোল মামা—হঠাৎ এ দিকে ছুটে এলে যে ?

রামকৃষ্ণ ॥ মহেশ চাটুয্যের সঙ্গে দাদা মন্দিরের দিকে গেলেন, তাই দেখেই তো এই দিকে ছুটে এলাম। বুঝলি হৃদে, শেষ পর্য্যন্ত দাদাই বোধহয় পূজো করতে গেলেন।

হৃদয় ॥ তা হবে। আচ্ছা মামা, কোলকাতায় এসে বোধহয় তোমার ভাল লাগছে না—না ?

রামকৃষ্ণ ॥ ভাল ? ভাল লাগবে না কেন ?—তবে কি জানিস্ হৃদু —মাঝে মাঝে মার জন্যে মনটা কি রকম করে ওঠে। কিন্তু করলে কি

হবে বল্—দাদাকে বাড়ীমুখো হবার কথা তো আর বলতে পারি না—বল্লেই চটে যাবেন। সংসার চালানোর ভাবনায় আমায় জোর করে টেনে নিয়ে এলেন। আরে বাপু, সংসার-টংসার কি আর আমার দ্বারা চালানো হয়—আমি সংসারের কি বুঝি যে চালাবো ?

হৃদয়॥ তা যাই হোক, তুমি এসে বড়মামার খানিকটা সুবিধে হয়েছে তো ?

রামকৃষ্ণ॥ ছাই হয়েছে, সুবিধের চেয়ে অসুবিধে হয়েছে বেশী। নিজে একা ছিলেন, যা হোক করে চালাতেন—এখন হয়েছে আবার আমার ভাবনা।

[রামকৃষ্ণ ও হৃদয়ের উপরোক্ত কথাগুলির মাঝে মন্দিরের শানাই, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল]

রামকৃষ্ণ॥ কি রে! ব্যাপার কি হৃদে, পুজো আরম্ভ হয়ে গেল নাকি ? তোদের গাঁয়ের মহেশ চাটুয্যে তো এসে বল্লে, পুরুত পিট্টান দিয়েছে, শেষ৷পর্য্যন্ত দাদাই কি পূজোয় লেগে গেলেন নাকি ?

হৃদয়॥ তা হোতে পারে।

[ইতিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ হৃদয় ও রামকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

বৃদ্ধ॥ কাদের ঠাকুর বাড়ী গা ?

হৃদয়॥ জানবাজারের রাণীমার—রাণী রাসমণির।

বৃদ্ধ॥ ও!—

[মায়ের উদ্দেশ্যে দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রামকৃষ্ণ বলিলেন]

রামকৃষ্ণ॥ ও কি গো! পেন্নাম করেই চলে যাচ্চ ? ঠাকুর দেখবে না ? মায়ের প্রসাদ নেবে না ?

বৃদ্ধ ॥ জানবাজারের রাণীর তো—

রামকৃষ্ণ ॥ বুঝেছি, জাতের কথা ভাবছো—তা হোলেই বা—

বৃদ্ধ ॥ [দাঁত মুখ খিঁচিয়ে] হোলেই বা, বাউনের ছেলে, গলায় পৈতে ঝুলিয়ে, কথাটা বোল্‌তে মুখে বাধলো না ? যত সব—

[বৃদ্ধ গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে প্রস্থান করিল]

রামকৃষ্ণ ॥ (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) দাদাকে বলিস্ হৃদু, আমি ঝামাপুকুরে ফিরে যাচ্ছি।

হৃদয় ॥ সে কি গো! হঠাৎ ঝামাপুকুরে ফিরে যাবার খেয়াল হোল কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ নাঃ! এ রাজসূয় যজ্ঞ! এখানে আর ভাল লাগছে না—

হৃদয় ॥ তা পেসাদ না নিয়েই চ'লে যাবে ?

[রামকৃষ্ণ মাথা নাড়িয়া জানাইলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, পেসাদ না নিয়েই চলে যাবো।

হৃদয় ॥ তা হলে দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। বড়মামাকে না হয় বোলে আসি।

রামকৃষ্ণ ॥ না রে না, তুই থাক। দাদা যান তো তাঁর সঙ্গে যাস, আমি না হয় কাল আবার আসবো—

[কথা কয়টি শেষ করিয়া রামকৃষ্ণ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যান। হৃদয় সেই দিকে চাহিয়া থাকে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূজারী রামকুমারের ঘরের সম্মুখভাগ। রামকুমার ঘরের বারান্দায় বসিয়া খেলো হুঁকায় তামাক খাইতে ছিলেন। সহসা রাণী রাসমণি প্রবেশ করিলেন। অদূরে পাইক বরকন্দাজদের দেখা গেল। রাসমণি প্রণাম করিলেন। সঙ্গে হরি চৌকিদার। রামকুমার হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

রামকুার ॥ (আশীর্ব্বাদ করিলেন) কল্যাণ হোক্—

রাসমণি ॥ বাবা, নিত্য পূজার কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে না তো?

রামকুমার ॥ অসুবিধা! বলেন কি মা! নিত্যই তো রাজসূয়! এ ভাবে মায়ের পূজোর ব্যবস্থা কোরতে ক'জন পারে?

রাসমণি ॥ কিন্তু তবুও মনে শান্তি নেই, রাত্রে ঘুম নেই, মনে হচ্ছে, কোথায় যেন খুঁত রয়ে গেছে—

রামকুমার ॥ খুঁত? আমি তো শাস্ত্রসম্মতভাবে, নিঃস্বার্থ মনেই মায়ের পূজো করছি মা—

রাসমণি ॥ আপনার দিক থেকে কোন ক্রটী নেই বাবা—মনে হচ্ছে, ক্রটী আমার। মা আপনার হাতে পূজো নিচ্ছেন,আপনার হাতের অন্নভোগ নিচ্ছেন, আর আমি ব্রাহ্মণ নই বোলে, ভিখারিরাও মায়ের প্রসাদী অন্ন নিচ্ছে না। রোজই মায়ের প্রসাদী ভোগ গঙ্গায় ফেলে দিতে হচ্ছে।

রামকুমার ॥ (ক্ষুণ্ণভাবে) এই জন্যেই তো আপনাকে তখন বোলেছিলাম মা, যে ঠাকুরবাড়ী ব্রাহ্মণের নামে দান করতে।

রাসমণি ॥ তাই তো কোরেছি বাবা!

রামকুমার ॥ তা জানি—সেই সময় আরও একটা কথা আপনাকে বোলেছিলাম বোধহয় মনে আছে, যে ব্রাহ্মণের নামে ঠাকুরবাড়ী দান কোরবেন, সেই ব্রাহ্মণের নামেই দেবীর পূজা ও অন্নভোগ হবে।

রাসমণি ॥ হ্যাঁ তা তো বোলেছিলেন। তাই কি করা হচ্ছে না?

রামকুমার ॥ হচ্ছে কিন্তু........

রাসমণি ॥ কিন্তু কি?

রামকুমার ॥ যারা ঠাকুর দেখতে আসে, তারা সবাই শোনে, এটা রাণী রাসমণির ঠাকুরবাড়ী। রাণী রাসমণির নামের সঙ্গে, ঠাকুরের পুজো, অন্নভোগ সবই যে জড়িয়ে আছে মা! রাজসিক সমারোহ দেখে, তারা অবাক হয়ে যায়! জগন্মাতাকে দেখতে এসে, তারা দেখে, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর! মাকে দেখতে এসে, তারা মেয়ের কথায় পঞ্চমুখ হোয়ে ওঠে—

রাসমণি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমি বুঝতে পারি নি। ঐশ্বর্য্যের এ দম্ভ, এ অহঙ্কার নিয়ে মায়ের পূজা কখনও সার্থক হয় না। অজ্ঞাতে আমি যে মহাপাপ করেছি, বুক চিরে রক্ত দিয়ে, আমি সে পাপ স্খালন করবো।

রামকুমার ॥ এ মন্দিরের পূজারী আমি। মা যদি অপ্রসন্না হোয়ে থাকেন, সে দোষ আমার। বুক চিরে রক্ত দিয়ে, আমিই মাকে প্রসন্না করবো।

রাসমণি ॥ (হরি চৌকিদারকে ডেকে) হরি—

[হরি চৌকিদার সামনে আসে]

সেজবাবুকে এখানে আসতে বলো—

[হরি চৌকিদার চলিয়া যায়]

বাবা! ঐশ্বর্য্য অহঙ্কার ত্যাগ না করলে যে মায়ের কৃপা লাভ হয় না, তা আমি বুঝতে পেরেছি। ঠাকুরের দর্শনার্থী যারা, তারা যে কেন রাণী রাসমণির ঠাকুরবাড়ী বলে তা আমি বুঝতে পেরেছি বাবা—আপনি ভাল-ভাবে সবাইকে জানিয়ে দিন, ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গীকৃত এই ঠাকুরবাড়ী, ব্রাহ্মণের নামেই নিত্যপূজা—ব্রাহ্মণের নামেই অন্নভোগ, রাসমণি মায়ের মন্দিরের পরিচারিকা মাত্র।

[ইতিমধ্যে মথুর আসেন। সঙ্গে হরি চৌকিদার]

মথুর ॥ আমায় ডাকছিলেন মা ?

রাসমণি ॥ হ্যাঁ বাবা। ঠাকুর বাড়ীর চৌকিদারদের পোষাক পাল্টে এখুনি সাদা জামা কাপড় পরাবার ব্যবস্থা কর। তক্‌মাধারী চৌকিদারেরা ভুলেও যেন কোনদিন আর তক্‌মা না আঁটে—

মথুর ॥ বেশ। এখুনি আমি ওদের পোষাক বদলে দেবার ব্যবস্থা করছি। [প্রস্থানোদ্যত]

রাসমণি ॥ আর শোন— (মথুর ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) সেরেস্তার সমস্ত কর্ম্মচারীদের বলে দাও মথুর, কেউ যেন কোনদিন রাসমণির ঠাকুরবাড়ী না বলে, এ ঠাকুরবাড়ী মা ভবতারিণীর, রাসমণির নয়—

মথুর ॥ আচ্ছা মা। আমি এখুনি বলে দিচ্ছি। [প্রস্থান]

[মথুর চলিয়া যাওয়ার পর রাসমণি কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। পরে বলেন]

রাসমণি ॥ বলুন বাবা। অজ্ঞাতে আর যদি কোন ভুল করে থাকি—

রামকুমার ॥ না মা! আমার আর কিছু বলবার নেই—ভুল সংশোধনের যে দৃষ্টান্ত আপনি দেখালেন, মানুষ তা শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরদিন স্মরণ করবে—

[রাসমণি গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রামকুমার আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাসমণি ও হরি চৌকিদার চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরদিক দিয়া রামকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন]

রামকুমার ॥ এই যে গদাই! কখন এলি ?

রামকৃষ্ণ ॥ এইতো আস্‌ছি।

রামকুমার ॥ আজ ক'দিন হোল আমি দক্ষিণেশ্বরে রয়েছি—এ ক'দিনের মধ্যে তোর আর একবার আসবার সময় হোল না ?

রামকৃষ্ণ ॥ সবাই মিলে এখানে থাকলে, তোমার ঝামাপুকুরের টোল যে পটল তুলবে গো !

রামকুমার ॥ টোল আর চালান সম্ভব হবে না গদাই। রাণীমাকে যখন কথা দিয়েছি, মায়ের পূজো করবো, তখন সে কথা তো আর ফিরিয়ে নিতে পারবো না। তুই বরং এক কাজ কর—ঝামাপুকুরে যা জিনিস-পত্র আছে গুটিয়ে নিয়ে এখানে চলে আয়।

রামকৃষ্ণ ॥ তাহলে তুমি এখানেই থেকে যাবে ?

রামকুমার ॥ না থেকে কি করি বল্? রাণী রাসমণি মা কালীর ভক্ত। শাস্ত্রসম্মতভাবে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মন্ত্রোচ্চারণ যখন করেছি—তখন যজমানের কল্যাণের জন্য, নিত্য পূজো করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় গদাই—

রামকৃষ্ণ ॥ বেশ। তুমি পূজো করো, প্রসাদী অন্নগ্রহণ করো, আপত্তি নেই। আমি কিন্তু ভোগের পেসাদ গ্রহণ কোরতে পারবো না।

রামকুমার ॥ আমি যদি ভোগের প্রসাদ গ্রহণ কোরতে পারি—তুই বা পারবি না কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ পারা আর না পারা, ও দুটো ইচ্ছের উপর নির্ভর করে।

রামকুমার ॥ ভোগের প্রসাদ গ্রহণ কোরতে অনিচ্ছাই বা হচ্ছে কেন, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। রাণী রাসমণি অব্রাহ্মণ বোলে ? কিন্তু ভোগের প্রসাদী অন্নের সঙ্গে রাসমণির সম্পর্ক কি ?

[রামকৃষ্ণ কোন উত্তর করেন না]

রামকুমার ॥ কিরে ? চুপ কোরে রইলি কেন ? উত্তর দে—

[রামকৃষ্ণ তথাপি নিরুত্তর]

রামকুমার ॥ বলি, পৈতের সময় ধাই মা ধনির হাত থেকে অন্ন নিয়েছিলি তো ? বলি, সে তো কামারণী—

[রামকৃষ্ণ এ কথারও কোন জবাব দেন না]

রামকুমার ॥ সিয়রের রাখালদের সঙ্গে বসে খেয়েছিলি তো ?

রামকৃষ্ণ ॥ খেয়েছিলাম।

রামকুমার ॥ কামারপুকুরে ছুতোরনি খেতির মার হাতের ডাল ভাত রান্না খেয়েছিলি তো ?

রামকৃষ্ণ ॥ খেয়েছিলাম।

রামকুমার ॥ তা বামুনের মেয়ে খেতির মাও নয়—রাসমণিও নয়।

রামকৃষ্ণ ॥ তা জানি।

রামকুমার ॥ তবে প্রসাদী অন্নগ্রহণ কোরতে আপত্তিটা কি ?

রামকৃষ্ণ ॥ কি জান, খেতির মার কাছে খেয়েছিলাম বিদুরের খুদ। আর এখানে রাণী রাসমণির দুর্য্যোধনের রাজভোগ।—বড্ড 'আমি', 'আমির' আঁশটে গন্ধ গো!

রামকুমার ॥ (চমকাইয়া) কি বল্লি ? 'আমি', 'আমির' আঁশটে গন্ধ ?

রামকৃষ্ণ ॥ হাঁ গো! এখানে পেসাদ পেতে তাইতো মন সরছে না —এখানে তো আর মা কাছে নেই, যে মাকে শুধোবো। মা বল্লে, সবই খাওয়া যায়। আবার সত্যিকারের মায়ের মতন ভালবেসে যদি কেউ দেয়, তা ও খাওয়া যায়। জাতই বলো—আর বেজাতই বলো—ও সবই তো মন নিয়ে বিচার গো—

রামকুমার ॥ তা হোলে তোর কি মত যে আমি ঝামাপুকুরে ফিরে যাই ?

রামকৃষ্ণ ॥ তা কি আর এখন হয় ? রাণীকে তুমি কথা যখন দিয়েছ—

রামকুমার ॥ তা তো দিয়েছি—কিন্তু তুই এখানে থাকবি তো ?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ থাকতে হবে বৈ কি! তোমার জন্যেই যখন মায়ের কথায় কামারপুকুর থেকে এখানে চলে এলাম—

রামকুমার ॥ তাই থাক গদাই, তাই থাক। প্রসাদী অন্ন গ্রহণ কোরতে যদি তোর মন না চায়, তা হোলে ঐ গঙ্গাতীরে গঙ্গাজলেই না হয় রেঁধে খাস। রাণীর দেবোত্তর সেরেস্তা থেকে—চাল, ডাল, ঘি, তেল, নূন, সব্জী, সিদে সাজিয়ে সব কিছুই দেয়—

রামকৃষ্ণ ॥ তা দিক—ওদের জিনিস নেবো কেন? দোকানে বাজারে সবই তো কিনতে পাওয়া যায়—দরকার মত কিনে নেব।

রামকুমার ॥ বেশ তাই নিস্—কিনেই না হয় নিস্।

তৃতীয় দৃশ্য

[জানবাজার। রাণী রাসমণির ঘর। পদ্মমণি, জগদম্বা ও রাণী রাসমণির আত্মীয় কন্যা সুকুমারী গোলকধাম খেলিতেছিল। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরে সেজ জ্বলিতেছে]

সুকুমারী ॥ সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আর খেলবো না ভাই।

জগদম্বা ॥ সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তা কি হয়েছে?

সুকুমারী ॥ মাসীমা এখুনি এসে পড়বেন, এসেই বকাবকি কোরবেন—

জগদম্বা ॥ না না, বকাবকি কোরবেন না, নে কড়ি চাল্।

[জগদম্বার উপরোক্ত কথাগুলি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণী রাসমণি প্রবেশ করেন ও বলেন]

রাসমণি ॥ কি রে? সন্ধ্যে হয়ে গেল—এখনো সব বসে বসে গোলকধাম খেলছিস্? যা—যা সব, গা ধুয়ে কাপড়-চোপড় কেচে ঠাকুর ঘরে গিয়ে, ঠাকুর নমস্কার কোরে আয়।

জগদম্বা ॥ জান মা—দিদি আজ তিন তিনবার বৈকুণ্ঠ থেকে লছ্‌মন্‌-ঝোলায় নেমে গেছে—

পদ্মমণি ॥ তা কি করবো—কড়ির যেমন দান পড়বে তেমনি হবে তো—

সুকুমারী ॥ জানেন মাসীমা, (জগদম্বাকে দেখাইয়া) জগর হাতে ভীষণ দান পড়ে। আজ তিন তিনবার ও খেলায় জিতেছে।

রাসমণি ॥ (হেসে) আর তোমরা দু'জনে বুঝি জগর কাছে হেরেছ ?

সুকুমারী ॥ হার বোলে হার—আমরা দান ফেলি, আর দু দশ ঘর কোরে নেমে যাই—আর ও টপাটপ্‌ দান ফেলে বৈকুণ্ঠে উঠে যায়।

পদ্মমণি ॥ (তাচ্ছিল্যভরে) হঁ্যা হঁ্যা—বৈকুণ্ঠ না হাতী—আজ হঠাৎ কি রকম ওর হাতে দান এসে গিয়েছিল।

[সহসা মথুর প্রবেশ করেন। তাঁর হাতে রামকৃষ্ণের গড়া একটি শিবমূর্ত্তি]

রাসমণি ॥ এই যে, এস বাবা, এস। তোমার হাতে কী ?

মথুর ॥ বড় ভটচাযি্য মশায়ের ছোট ভাই, গঙ্গামাটী দিয়ে এই শিবটি গড়েছেন—

রাসমণি ॥ তাই নাকি ? দেখি—দেখি—

[মথুরের হাত হইতে মূর্ত্তিটি লইয়া]

রাসমণি ॥ বাঃ ! বাঃ ! বেশ সুন্দর গড়িয়েছেন তো !

[পদ্মমণির দিকে আগাইয়া দিয়া]

এই মূর্ত্তিটি ঠাকুর ঘরে নিয়ে যাও। রোজ এঁর পায়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে প্রণাম করবে।

পদ্মমণি ॥ ওটা তোমার ছোটমেয়েকেই দাও মা—আজ ওর তিন তিন-বার বৈকুণ্ঠলাভ হয়েছে—ওটা ওরই প্রাপ্য।

রাসমণি ॥ (হেসে) আচ্ছা, ওটা ছোটকেই দিচ্ছি।

[জগদম্বার হাতে শিবমূর্ত্তিটি দিলেন]

মথুর ॥ (সবিস্ময়ে) বৈকুণ্ঠলাভ !

[পদ্মমণি, সুকুমারী ও রাসমণি হাসিয়া ওঠেন]

রাসমণি ॥ আর বল কেন বাবা—তিনজনে বসে গোলকধাম খেলছিল। ছোট বুঝি ওদের তিন তিনবার হারিয়ে দিয়ে বৈকুণ্ঠে উঠেছে। তাই ওরা ঠাট্টা করছে। যা—এখনো সব দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কাপড়-চোপড় কেচে নিগে যা—সন্ধ্যে না হোলে আর তোদের কাপড়-চোপড় কাচা হয় না।

[পদ্মমণি, সুকুমারী ও জগদম্বা চলিয়া গেল]

রাসমণি ॥ বস বাবা বস। মায়ের সেবা ঠিকমত হচ্ছে তো বাবা?

মথুর ॥ হ্যাঁ মা। যাতে কোন ত্রুটী না হয়, তারজন্যে বড় ভট্টচাযি্য মশায় সব দিকে নজর রেখেছেন।

রাসমণি ॥ নিষ্ঠাবান, নির্লোভ ব্রাহ্মণ, মা যেন ওঁরই হাতে পূজো নেবেন বোলে, নিজেই নিজের সব ব্যবস্থা কোরে নিয়েছেন। নইলে আমরা তো ভৈরব ভট্টচাযি্যকেই পূজারী নিযুক্ত কোরেছিলাম।

মথুর ॥ ঠিকই বোলেছেন মা—এঁকে না পেলে দেবদেবীর সেবার এমন সুব্যবস্থা আমরা কখনই কোরতে পারতাম না। আমি আরও আশ্চর্য্য হোয়ে গেছি—ভট্টচাযি্য মশায়ের ছোট ভাইটিকে দেখে! যেমন দাদা, তেমনি ভাই—অল্প বয়েস—চোখে মুখে সারল্যের ছাপ—কে বলবে যুবক? দেখে মনে হয়, যেন ছোট্ট শিশু!

রাসমণি ॥ তাই নাকি?

মথুর ॥ হাঁ মা। কিন্তু কাছারী ঘরের কর্ম্মচারীরা বলছিলো—ভট্টচাযি্য মশায়ের ভাইয়ের মাথার নাকি একটু গোলমাল আছে। আমার

কিন্তু পাগল বোলে মনে হোল না। এমন সুন্দর মূর্ত্তি যিনি তৈরী কোরতে পারেন—তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে মা!

রাসমণি॥ আছে বৈ কি বাবা! কল্পনায় আমরা যে মূর্ত্তি দেখি, বাস্তবে তাকে রূপ দেওয়া, বড় যে সে কথা নয়।

মথুর॥ তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা না কোরেই, ভট্‌চাযি্য মশায়ের ভাইটিকে ঠাকুরের বেশকার নিযুক্ত করে এলাম।

রাসমণি॥ শিল্পীর হাতে বেশকারের ভার দিয়েছ, এতো ভালই করেছ মথুর।

[সহসা ঘরের বাহিরে মহেশের গলা শোনা যায়]

মহেশ॥ মা—

রাসমণি॥ কে?

মহেশ॥ আমি মহেশ--

মথুর॥ চাটুয্যে মশায়, আসুন—আসুন—[মহেশ ঘরে প্রবেশ করেন] কি খবর?

মহেশ॥ সর্ব্বনাশ হয়েছে! এইমাত্র দক্ষিণেশ্বর থেকে খবর এলো—রাধাগোবিন্দের পূজারী ক্ষেত্রনাথের হাত ফস্‌কে গোবিন্দ বিগ্রহ পড়ে গিয়ে, পা ভেঙ্গে গেছে!

রাসমণি॥ [শঙ্কিতভাবে]—এঁ্যা! সে কি!

মথুর॥ এ অসাবধান পূজারীকে তো কোনমতেই রাখা যায় না মা—এখুনি একে জবাব দেওয়ার দরকার।

রাসমণি॥ জবাব না হয় দিলে মথুর, কিন্তু আমি ভাবছি—বিগ্রহের কি হবে? এ অকল্যাণ—এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? আমি যে বড় সাধ কোরে মাতৃ-বিগ্রহের পাশে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি স্থাপনা কোরেছি।

শ্যাম—শ্যামা অভেদ ! এই কল্পনা নিয়েই যে আমি পাশাপাশি দুই মন্দির গড়ে তুল্‌লাম—এ আমার কি হোল মথুর—এ আমার কি হোল ?

[রাণী কাঁদিতে লাগিলেন]

মথুর ॥ অজ্ঞেয় দৈবের পরিহাস মা—নইলে এমনই বা হবে কেন ?

মহেশ ॥ সত্যিই তাই।—রাধাগোবিন্দের ভোগারতি সেরে শয়ান ঘরে শয়ান দিতে যাচ্ছিলেন ক্ষেত্র চাটুয্যে মশায়—সহসা পড়ে গিয়ে এই এই অঘটন ঘট্‌লো !

রাসমণি ॥ কিন্তু এখন উপায় কি ? আমি যে বড় সাধ করে দশ বছরের স্বপ্নকে সফল করবার জন্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কোরেছি।

মথুর ॥ ব্যাকুল হবেন না মা—যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে কি কোরে এখন উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে বিধান নিয়ে দেখা যাক, এ সম্বন্ধে তাঁরা কি বলেন।

রাসমণি ॥ তা হোলে আর দেরী নয়, কাল সকালেই মায়ের মন্দিরে পণ্ডিতদের ডাক। প্রায়শ্চিত্ত করাবার ব্যবস্থা করো। আমায় পাপ মুক্ত করো বাবা—আমায় পাপ মুক্ত করো—

[রাণী খাটের উপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন—মথুর ও মহেশ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

চতুর্থ দৃশ্য

[পরদিন সকাল। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। রাণী রাসমণির কর্ম্মচারীরা সভার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলাবলি করিতেছে]

ঘনশ্যাম॥ কৈ গো গোঁসাই—সময় তো হোয়ে এল—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তো এখনো দেখাই নেই।

শঙ্কর॥ দেখা আর কারুরই পাবে না চক্কোত্তি—আমার মনে হয়, বাউন পণ্ডিতেরা এতক্ষণে আবার সমিতি কোরে বোসেছে।

গজানন॥ সমিতি?—সে আবার কি গো শঙ্কর গোঁসাই?

শঙ্কর॥ সমিতি কি জান না? মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় দেখ নি?—বাউন পণ্ডিতেরা সব এককাট্টা হোয়েছিল।

ঘনশ্যাম॥ ওঃ! তাই বলো? তাহলে বলছো বাউন পণ্ডিতেরা ঠাকুর ভাঙ্গার বিধান দিতে আর কেউ আসবে না?

শঙ্কর॥ আমার মনে হয়, না। গোস্বামী সন্তান আমি—পূজো করি আর না করি—পূজোর জমা খরচের হিসেব লিখি তো। আমায় জিজ্ঞেস কোরলে এতক্ষণ আমি সোজা উপায় বাত্‌লে দিতাম।

গজানন॥ কি উপায় বাত্‌লে দিতে শুনি?

শঙ্কর॥ আমার খরচের খাতায় সব লেখা আছে। ওঁদের গয়না, আসবাব পত্রের কত খরচ হয়েছে—সব আমার নখদর্পণে। রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি তৈরী করতে কত খরচ হোয়েছিল তাও লেখা আছে। এখন

গোবিন্দের পা ভেঙ্গেছে—রাধা বিয়োগ দিয়ে দাও—গোবিন্দের দাম বেরিয়ে আসবে।

ঘনশ্যাম ॥ তা না হয় বুঝলাম—কিন্তু তার সঙ্গে ঠাকুরের পা ভেঙ্গে যাওয়ার বিধানের কি সম্পর্ক আছে ?

শঙ্কর ॥ আছে বৈ কি—ঐ ভাঙ্গা বিগ্রহকে গঙ্গায় টুপ্ করে ফেলে দিয়ে, আবার নতুন বিগ্রহ আনিয়ে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া আর পথ নেই—নান্য পন্থাঃ। এবং তার জন্যে কি খরচ পড়তে পারে, সেজবাবু বা রাণীমা যদি আমায় একবার জিজ্ঞেস করেন,—তাহলে খাতা না দেখে আমি তক্ষুণি বলে দিতে পারি।

গজানন ॥ সবই তো বুঝলাম গোঁসাই—এতই যদি তোমার জানা আছে, তা হোলে হিসেব না লিখে, পূজোর কাজ নিলেই তো পারতে ?

শঙ্কর ॥ ঠাকুর পূজো করার চেয়ে, ঠাকুরের সেবার হিসেব লেখা আরও শক্ত—তা জান ?

গজানন ॥ কি রকম ?

শঙ্কর ॥ আমি খাতা না দেখে বোলে দিতে পারি, পুরুত পূজো করেছে কতক্ষণ, জপ্ করেছে কবার—আরতি করবার সময় পঞ্চপ্রদীপ ক'বার ঘুরিয়েছিল—আর তাতে তেল খরচ হয়েছে কত।

ঘনশ্যাম ॥ বলো কি গোঁসাই!—তোমার হিসেবের খাতায় এসবও লেখা থাকে নাকি ?

শঙ্কর ॥ তবে—? গোস্বামী সন্তান—পরম বৈষ্ণব আমি—সাত পুরুষে শুধু লোকের মাথায় পা তুলে দিয়ে ট্যাঁকে টাকা গুঁজে চলে এসেছি। বাবা মারা গেলে, শিষ্য ভাগ হোল—৯৯৭ ঘর শিষ্য ছিল আমাদের। তিন ভাই আমরা, এক একজনের ভাগে পড়্ল ৩৩২। কিন্তু একটি শিষ্য রইলেন বক্রী—সেই বাড়্তি শিষ্যটিকে নিয়ে বাধলো গণ্ডগোল।

বোল্‌লাম দরকার নেই গণ্ডগোলে। ৯৯৬ জন শিষ্যের উপরে তোমরা গুরুগিরি করো—আমার জন্যে ঐ একটিই থাক।

গজানন ॥ বলো কি গোঁসাই ? তোমার এই অসাধারণ ত্যাগের কথা তো কোনদিন শুনি নি ?

শঙ্কর ॥ শুনবে কোত্থেকে—আত্মপ্রচার করা আমি ভালবাসি না।

[সহসা অপর একজন কর্ম্মচারী গণেশ ভট্টাচার্য্যি সেখানে প্রবেশ করিয়া জানাইল]

গণেশ ॥ গোঁসাইজী—রাণীমা আর সেজবাবু আসছেন।

[কর্ম্মচারীরা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল]

শঙ্কর ॥ (অন্যমনস্কভাবে) পাঠিয়ে দাও—

ঘনশ্যাম ॥ বলছো কি—রাণীমা ! সেজবাবু !

শঙ্কর ॥ ও ! তাহলে আমরা যাই।

গজানন ॥ না না—তুমি থাক গোঁসাই—আমরা বরং যাই। দরকার হোলে তুমি হিসেব নিকেশ দাখিল করতে পারবে।

[শঙ্কর ও কর্ম্মচারীদের উপরোক্ত কথার মাঝে রামকুমার ও কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ঘরে প্রবেশ করেন। শঙ্কর তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলেন]

শঙ্কর ॥ আসুন—আসুন—আজ্ঞে হোক। আসন গ্রহণ করুন।

[শঙ্কর অভ্যর্থনা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে যাইবেন এমন সময় রামকুমার বলেন]

রামকুমার ॥ এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। সেজবাবু আর রাণীমাকে খবরটা দিন গোঁসাইজী—

শঙ্কর ॥ যে আজ্ঞে—

[শঙ্কর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা চলিয়া গেল]

রামকুমার ॥ আপনাদের ডাকার উদ্দেশ্য, বিষ্ণু বিগ্রহের ব্যাপারে আপনাদের মতামত নেওয়া—আপনারা সকলেই পরম বৈষ্ণব, এ বিষয়ে আপনাদের মতামত নেওয়াই সমীচীন।

১ম বৈষ্ণবাচার্য্য ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

হরি চৌকিদার ॥ (নেপথ্যে) হুশিয়ার রাণীমা !

[ইতিমধ্যে রাসমণি ও মথুর আসিয়া সভাস্থ হইলেন]

রামকুমার ॥ (মথুরের প্রতি) আমি এঁদের সমস্ত বিষয়ই বলেছি।

মথুর ॥ আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা আপনারা শুনেছেন ?

১ম বৈষ্ণবাচার্য্য ॥ শুনেছি। তবে ভাঙ্গা মূর্ত্তির পূজা চলতে পারে না।

[ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

১ম বৈষ্ণবাচার্য্য ॥ ও মূর্ত্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে হবে।

রাসমণি ॥ এত সাধ করে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কোরলাম—অমন অপরূপ মূর্ত্তিটিকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেব ?

১ম বৈষ্ণবাচার্য্য ॥ এই শাস্ত্রের বিধান মা—ও মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কোরে তবেই পূজা চলতে পারে।

রামকৃষ্ণ ॥ কেনে গো ? পুরোনো মূর্ত্তি কি অপরাধ করলো ?

রামকুমার ॥ তুই এখান থেকে যা গদাই। এখানে শাস্ত্রের বিধান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে !

রামকৃষ্ণ ॥ তা জানি। কিন্তু ভাঙ্গা বিগ্রহকে জলে ফেলে দিতে হবে, কেনে ? বলি, রাণীমার এই জামাইয়ের—বা জামাইদের মধ্যে আর কারো যদি পা ভেঙ্গে যায়—তা হোলে সে জামাইকে কি জলে ফেলে দেওয়া হবে —না সেই ভাঙ্গা পা যাতে জোড়া লাগে সেই চেষ্টা করা হবে ?

রাসমণি ॥ ভাঙ্গা পা যাতে জোড়া লাগে সেই চেষ্টাই করা হবে বাবা—

রামকৃষ্ণ ॥ তাইতো বলছি গো—ভক্তি ভাবে ভাঙ্গা পা যদি জোড়া লাগাতে পার, তা হোলেই তো সব ল্যাঠা মিটে যায়।

রাসমণি ॥ মথুর—আমি নির্দ্দেশ পেয়ে গেছি। যাঁকে গোবিন্দ জ্ঞানে এতদিন প্রণাম করেছি—তাঁকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে আমি পারবো না।

১ম বৈষ্ণবাচার্য্য ॥ কিন্তু ভাঙ্গা বিগ্রহের পূজা করলে কখনই তা শাস্ত্রসম্মত হবে না রাণী মা!

রাসমণি ॥ শাস্ত্রকে আমি অস্বীকার বা অবজ্ঞা করছি না বাবা, কিন্তু যে যুক্তি অন্তরকে স্পর্শ কোরেছে, তাকেই আমি গ্রহণ করতে চাইছি।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করুন রাণীমা। আমি আপনার রাধা-গোবিন্দের ভাঙ্গা পা এমন নিখুঁত কোরে এক্ষুনি জুড়ে এনে দেবো, যে কারুর সাধ্য নেই যে ধরে—

[রামকৃষ্ণ বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

১ম বৈষ্ণবাচার্য্য ॥ (রামকুমারের দিকে চেয়ে) আপনার ছোট ভাইটি কি উন্মাদ? বলে কি?

২য় বৈষ্ণব ॥ নিরেট মূর্খ না হোলে কি কেউ এমন কথা মুখে আন্‌তে পারে?

৩য় বৈষ্ণব ॥ ভাঙ্গা বিগ্রহের পূজা করে শাস্ত্রকে পরিহাস করা হবে মাত্র।

১ম বৈষ্ণবাচার্য্য ॥ আপনারা যদি শাস্ত্রকে মেনে না চলেন—তা হোলে অনর্থক আমাদের মতামত গ্রহণের জন্য আহ্বান করার কোন কারণ ছিল না।

রাসমণি। কিন্তু ছোট ভট্‌চায্যি মশায়ের যুক্তি আমার অন্তরকে ভরিয়ে তুলেছে। আপনারা শাস্ত্রের যত নজিরই দেখান না কেন—

এমনতর সোজা সহজ যুক্তি দিয়ে আপনারা আমার মনকে ভরিয়ে তুলতে পারবেন না।

১ম বৈষ্ণবাচার্য্য ॥ বেশ, আপনার মন যা চায়, আপনি তাই করুন। কিন্তু জেনে রাখুন রাণীমা, ভাঙ্গা বিগ্রহের পূজা হয় না—হোতে পারে না।

[ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ পুনরায় ফিরিয়া আসেন—
তাঁহার গায়ের চাদরের মধ্যে গোবিন্দ বিগ্রহ]

রামকৃষ্ণ ॥ কে বলে ভাঙ্গা বিগ্রহ ? যিনি 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্'—তাঁর কখন পা ভাঙ্গে ? না ভাঙ্গতে পারে ? দেখুন—তো ?

[চাদরের ভিতর হইতে গোবিন্দ মূর্ত্তি বাহির
করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, গোবিন্দের
পদযুগলের কোথাও ভাঙ্গার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই]

মথুর ॥ এ কি ! ভাঙ্গার যে কোথাও চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। দেখুন মা, ছোট ভট্‌চায্যি মশায় কিভাবে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ ॥ না—না, আমি নই—আমি নই—গোবিন্দই সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

রাসমণি ॥ মথুর, সত্যিই পা ভেঙ্গেছিল কি ? না আমাদের দেখার ভুল ?

মথুর ॥ না মা, ভুল নয়—আমি নিজের চোখে দেখেছি—

রাসমণি ॥ ঠাকুর দুর্ঘটনার পর থেকে নানান ভয় ভাবনায় অন্তর আমার তোলপাড় করছিলো—শঙ্কাহারী—তুমিই তার অবসান কোরেছ। তাই, আজ থেকে রাধাগোবিন্দকে আমি তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি—আজ থেকে রাধাগোবিন্দের সকল ভার তোমার—সকল ভার তোমার।

[রাসমণি রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন]

পঞ্চম দৃশ্য

[রামকুমারের ঘর। হৃদয় ঘরের কাজ করিতেছিল। ইতিমধ্যে শঙ্কর গোঁসাই একটি কলিকা হস্তে সেখানে প্রবেশ করেন। শঙ্করকে দেখিয়া হৃদয়ের চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল]

শঙ্কর ॥ (দেঁতো হাসি হেসে)—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ! এই এলাম একটু কল্‌কেটায় আগুন দিতে।

হৃদয় ॥ (বিরক্তিভাবে) ও!

শঙ্কর ॥ (কল্‌কের দিকে চেয়ে) দেখো—একবার মনের ভুল! কল্‌কেটায় তামাক টিকে না দিয়েই চলে এসেছি!

হৃদয় ॥ ও! তা কল্‌কেটায় একটু তামাক টিকে চাপিয়ে নিন।

শঙ্কর ॥ নেব? তা নিই! (কল্‌কেতে টিকে ও তামাক দিতে দিতে) শুনছিলাম, ভট্‌চায্যি মশাইয়ের শরীরটা নাকি ভাল যাচ্ছে না?

হৃদয় ॥ হ্যাঁ, বড় মামার শরীরটা ভাল নেই—

শঙ্কর। শরীর আর ভাল থাকবে কি করে? কলকাতার আশে পাশের জল হাওয়া বড় দূষিত হয়ে গিয়েছে। দিনরাত কলকারখানার চিম্‌নির যা ধোঁয়া! আচ্ছা, চলি—

হৃদয় ॥ যাবেন কেন? তামাক, টিকে মায় ধরানো পর্য্যন্ত যখন হোল, তখন হুঁকোটা নিয়ে, দুটান না হয় এখানেই দিলেন—

শঙ্কর ॥ না না, ও হুঁকোয় ত চলবে না, ওটা যে শাক্ত হুঁকো হাজার!

হোক, আমি গোস্বামী সন্তান তো! শাক্তর তামাক টিকে মায় আগুনটি পর্য্যন্ত চলে, কিন্তু হুঁকোটা ত চলে না—আচ্ছা আসি।

[শঙ্কর চলিয়া যায়। হৃদয় কটমট্ করিয়া সেদিকে চাহিয়া থাকে ইতিমধ্যে রামকুমার প্রবেশ করেন]

রামকুমার॥ কি রে হৃদু, কি হোল? অমন করে চেয়ে কি দেখছিস্?

হৃদয়॥ দেখছি, গোঁসাই ঠাকুরকে—শয়তানের ধাড়ি! নিত্যি নিত্যি ও তামাক টিকে নিয়ে আসতে ভুলে যায়—

রামকুমার॥ (হেসে) ও! তা যাক্—আমায় একটু তামাক খাওয়া দিকিনি!

[হৃদয় তামাক সাজিতে বসে ও উত্তেজিতভাবে বলে]

হৃদয়॥ মামা! আমি ওকে খুন করে ফেল্‌বো! থান ইঁট মেরে ওর মাথা ভাঙ্গবো! সব তামাকটা কলকেয় চাপিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে!

রামকুমার॥ তা আর কি হবে? থাক গে—

হৃদয়॥ থাকবে কেন? চট্ করে তামাক নিয়ে আসি না?

রামকুমার॥ পরে আনিস্। আচ্ছা হৃদু, তুই ঠিক দেখেছিস্, গদাই রোজ রাত্তিরে বনের দিকে যায়?

হৃদয়॥ হ্যাঁ বড়মামা। শুধু যাওয়া নয়—আমি নিজের চোখে দেখেছি, পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে ঐ আমলকী গাছটার নিচে বোসে ধ্যান করে। দূর থেকে ইঁট্ ছুঁড়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। খানিকবাদে আমলকীতলা থেকে উঠে এলে জিজ্ঞাসা কোরলাম—পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে কচ্ছিলে কি? বল্লেন—"জপ করছিলাম"। বোল্লাম—পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে জপ! লোকে বলবে কি?—বল্লেন—হ্যাঁরে সব ত্যাগ কোরেই তো মাকে ডাকতে হয়।

রামকুমার ॥ (চিন্তিতভাবে) হুঁ—কিন্তু আমি ভাবছি হৃদু, ও এইসব কোরতে লাগলো—নিজেরও শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, কি যে করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। মায়ের পূজোর কাজকর্ম্মগুলো একটু দেখে নিলে আমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারতাম।

হৃদয় ॥ তা তোমার যখন এমন শরীর, তখন না হয় দিনকতক দেশেই যাও বড়মামা।

রামকুমার ॥ কিন্তু কি কোরে নিশ্চিন্ত হোয়ে যাই বল্ দিকিনি—একে তো এখানকার কোন কর্ম্মচারীই ওকে ভাল চোখে দেখে না—তার ওপর এই সব নিয়ে যদি ও মেতে থাকে—তা হোলে ওর ওপরে ভার দিয়ে যাই কেমন কোরে?

[ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন

রামকুমার ॥ এই যে গদাই—আয় বোস্, তোর কথাই এতক্ষণ বলছিলাম—সারাদিন যে কোথায় থাকিস্, কোথায় যাস্—

রামকৃষ্ণ ॥ যাবো আবার কোথায়? ঐ গঙ্গার ধারেই ঘুরে বেড়াই—বেশ লাগে।

রামকুমার ॥ তা তো লাগে—কিন্তু আমার যে এখানে মোটেই শরীর টিঁকছে না—ক্রমশই ভেঙ্গে পড়্ছে—

রামকৃষ্ণ ॥ তা তুমি দিনকতক দেশে যাও না—শরীরটা শুধরে এসো—

রামকুমার ॥ কিন্তু যাই কি কোরে! পূজো-আচ্ছার সব ভার যদি নিস্, তা হোলে না হয় যেতে পারি।

রামকৃষ্ণ ॥ (হৃদয়ের দিকে চাহিয়া) কি রে হৃদু, দাদাকে ছুটী দিতে পারবি?

হৃদয় ॥ কেন পারব না? তুমি একবার 'হ্যাঁ' বোললেই পারি।

রামকৃষ্ণ ॥ তা হৃদে যখন বল্‌ছে, তুমি না হয় দিনকতক দেশেই যাও দাদা—পূজোর কাজ যা হোক করে আমরাই চালিয়ে নেব।

রামকুমার ॥ হৃদয়ের কাছে শুনছিলাম, তুই নাকি রাত ভোর জঙ্গলে ঢুকে বসে থাকিস্‌?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ—

রামকুমার ॥ কিন্তু করিস্‌ কি ওখানে?

রামকৃষ্ণ ॥ মায়ের নাম জপ করি।

[ইতিমধ্যে হৃদয় তামাকের কৌটা লইয়া প্রস্থান করে]

রামকুমার ॥ ঐ কবরডাঙ্গায় মা কালীর নাম জপ করিস্‌? কেন? মন্দিরে কি হোল?

রামকৃষ্ণ ॥ মন্দির ওরা বন্ধ করে রাখে, তাই—

রামকুমার ॥ (চিন্তিত মনে) হুঁ! হৃদে বলছিলো, পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে তুই আমলকীতলায় আসন কোরে বসিস্‌—এ তো শুধু জপ নয়—এ যে তন্ত্র-সাধন—

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ—তাই তো।

রামকুমার ॥ তাইতো কি রে! কিন্তু তন্ত্র-সাধনা করার আগে দীক্ষা নে—সাধন কি অমনি হয়? সাধনের বীজমন্ত্র চাই যে—

রামকৃষ্ণ ॥ তাহলে দীক্ষা দাও।

রামকুমার ॥ আমি কি দীক্ষা দিতে পারি? হাজার হোক্‌ আমি তোর সহোদর। কেনারাম ভট্টচায্যি প্রবীণ শক্তিসাধক, আমি বোলে দেবো, তাঁর কাছে তুই দীক্ষা নিস্‌। এর মধ্যে প্রশস্ত দিন দেখে, তোর দীক্ষার ব্যবস্থা করি—তারপর শক্তি পূজার যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ম্ম তোকে ভালভাবে শিখিয়ে দিয়ে—আমি দিনকতক ছুটী নেব।

রামকৃষ্ণ ॥ বেশ তো, তাই হবে!

ষষ্ঠ দৃশ্য

[খাজাঞ্চিখানা। ঘনশ্যাম ও শঙ্কর হিসাব নিকাশের কাজে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে দপ্তরখানার চাকর বামনদাস মুড়ি-মুড়্‌কি খাইতে খাইতে প্রবেশ করিল। খাতা হইতে মুখ তুলিয়া এক নজর দেখিয়া ঘনশ্যাম বলে]

ঘনশ্যাম ॥ এই যে বাম্‌না, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

শঙ্কর ॥ থাকবে আবার কোথায় ? একবার এ মন্দির, আর একবার ও মন্দির করছিল। এক জায়গায় শশা কলা, আর এক জায়গায় সন্দেশ।

বামন ॥ গোঁসাই ঠাকুর কেবল আমায় শশা কলা খেতেই দেখেন—

শঙ্কর ॥ নে নে, তামাক সাজ! আবার চোপা হচ্ছে। কাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই—বাক্যির বহর আছে—

বামন ॥ বাক্যি কি আর সাধে বেরোয় ? সারাদিন খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌ করলেই বেরোয়—

শঙ্কর ॥ শোন হে চক্কোত্তি—সারাদিন আমরা নাকি খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌ করি—

[ইতিমধ্যে কড়ি বাঁধা একটি হুঁকায় কলিকা ধরাইয়া বামনদাস ঘনশ্যামকে দেয়। শঙ্কর আড়-চোখে চাহিয়া দেখে ও বলে]

শঙ্কর ॥ আর একটা কলকেয় আগুন দে—

বামন ॥ দিচ্ছি—

[ইতিমধ্যে গণেশ ভট্‌চায ঘরে প্রবেশ করে। কাঁধের উড়ানীটি তক্তপোষের উপর নামাইয়া বলে]

গণেশ ॥ বামনদাস, এক গেলাস জল খাওয়াও ত বাবা।

বামন ॥ আজ্ঞে দিই—

গণেশ ॥ ঘন ঘন জল তেষ্টা পাচ্ছে কেন বলত গোঁসাই ?

[ইতিমধ্যে বামন হুঁকাটি শঙ্করকে দিয়া জল আনিতে যায়]

শঙ্কর ॥ শক্তি ঘরের প্রসাদ খেয়ে হজম করা শক্ত ভট্‌চায্‌—একটু বুঝে-সুজে খেও—অম্বল হচ্ছে বোধহয়—চোরা অম্বল, বড় মারাত্মক ব্যাধি।

গণেশ ॥ ও ! গোঁসাই তো দেখছি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ! স্মৃতিশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসাশাস্ত্র—সবই জানা আছে।

[ইতিমধ্যে বামন জল দেয়, গণেশ জল পান করিয়া গেলাস ফিরাইয়া দেয়]

শঙ্কর ॥ তবে ? শাস্ত্র জানি কি না জানি, দেখলে ত সেদিন ; যা বলেছিল এই শম্মা, তা বলে গেল রামশম্মা।

গণেশ ॥ রামশম্মা আবার কে গোঁসাই ? বল, রামকৃষ্ণ ভট্‌চায্‌—

শঙ্কর ॥ আরে ওর কথা কে বল্‌ছে ? বলছি—বৈষ্ণব পণ্ডিতদের কথা, যাঁরা বিধান দিতে এসেছিলেন,তাঁদের কথা। কি গো চক্কোত্তি ? পণ্ডিতদের বিধান দেওয়ার আগেই আমি বলিনি যে, ভাঙ্গা বিগ্রহের পূজো চলতে পারে না ?

ঘনশ্যাম ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বলেছিলে বৈকি গোঁসাই—

শঙ্কর ॥ তাই তো বলছি গো ! যা বলে গেল এই শম্মা ; তা ব'লে গেল রামশম্মা !

গণেশ ॥ তা রামশম্মার বিধান ত আর রাণী মা মেনে নেননি—শেষ পর্য্যন্ত ছোট ভট্‌চায্যির বিধানই ত মেনে নিলেন—

ঘনশ্যাম ॥ তা নিলেন। কিন্তু কাজটা ভাল করলেন না। কদিন

পেরুলো না—বড় ভট্‌চায্‌ রোগে পড়লেন। এমনি শরীরের অবস্থা হলো যে শেষ পর্য্যন্ত তল্‌পী তল্‌পা গুটিয়ে দেশে পালাতে হচ্ছে—

শঙ্কর॥ হবেই ত। অনাচার সইবে কেন? তা বড় ভট্‌চায্‌-এর দেশে যাওয়ার খবর তুমি কার কাছে শুন্‌লে?

ঘনশ্যাম॥ ওঁর ভাগ্নে হৃদয়রামের কাছে।

শঙ্কর॥ ও! তা হলে ওর জায়গায় কাজ করবে কে?

ঘনশ্যাম॥ শুনলাম ত ওর পাগ্‌লা ভাইটাই নাকি কাজ করবে।

শঙ্কর॥ তা হলেই হয়েছে—

গণেশ॥ কেন? ওর ভাই পূজোর কাজকর্ম্ম কিছু জানে না নাকি?

শঙ্কর॥ জানে বৈকি! নইলে ভাঙ্গা ঠাকুরের পূজোর বিধান দেয়?

ঘনশ্যাম॥ শুনলাম, পাগলাটা সেদিন নাকি অখণ্ড মণ্ডল-টণ্ডল বলে কি সব শাস্ত্র আউড়েছে—

শঙ্কর॥ শালা ষণ্ড কোথাকার! খণ্ডর আবার অখণ্ড কি রে? মণ্ডল না ওর মুণ্ডু! বসতে দিত একবার সভায়, তা হলে শাস্ত্রের নজির কি ভাবে দিতে হয়, একবার দেখিয়ে দিতাম। বুঝলে, ঠাকুর দেবতা নিয়ে সব ছেলেখেলা সুরু করেছে—নইলে দশবার পা পিছ্‌লে পড়লেও যে পুরুতের চাকরী যায় না—একবার মাত্র পা পিছ্‌লে পড়ে গেল বলে, তার চাকরী চলে গেল!

ঘনশ্যাম॥ যা বলেছ—

শঙ্কর॥ ক্ষেত্রনাথ পড়ে গিয়ে গোবিন্দের পা ভেঙ্গেছিল, এবার পাগলাটার হাতে পড়ে মা ভবতারিণীর কি দুর্গতি হবে কে জানে?

[সহসা হুঁকার দিকে নজর করিয়া রুক্ষস্বরে হাঁকিলেন]

—বামনা—এই বামনা—

[শশব্যস্ত হইয়া বামনদাস প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়া চোখ কপালে তুলিয়া অভিসম্পাত করিয়া শঙ্কর বলে]

—তোর সর্ব্বনাশ হবে! এ জন্মে তোর এই দশা! পরের জন্মে তুই মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাবি। আমি গোস্বামী সন্তান! তুই শেষে কিনা—

ঘনশ্যাম॥ কি? ব্যাপার কি গোঁসাই! ও বেচারীকে হঠাৎ অভিসম্পাত করে বস্‌লে কেন?

শঙ্কর॥ করবো না? (হুঁকা দেখাইয়া) দেখ, দেখ, কি কাণ্ডটা করেছে—দেখ—

ঘনশ্যাম॥ যাক্‌গে যাক্, ভুলে কড়ি বাঁধা হুঁকোটা দিয়ে ফেলেছে বোধ হয়—

বামন॥ না চক্কোত্তি মশাই, ভুলে দেবে কেন? ঠিক দেখেই ত দিয়েছি।

শঙ্কর॥ দেখ চক্কোত্তি. দেখ, বলে কিনা ঠিক দেখেই দিয়েছি—

বামন॥ হ্যাঁ দিয়েছিই ত! দেখুন না ভাল করে। আপনার হুঁকোয় কড়িও বাঁধা আছে, মালাও বাঁধা আছে—

[শঙ্কর হুঁকাটি পুনরায় দেখিল। সত্যিই হুঁকায় কড়িও মালা বাঁধা]

শঙ্কর॥ একি! আমার তুলসী কাঠের মালা বাঁধা হুঁকোয় কড়ি বাঁধলো কে?

বামন॥ তা আমি কি করে জানব? ভাবলাম, আপনি গোঁসাইও বটে আর বাউনও বটে, তাই মালার সঙ্গে বোধহয় কড়িটাও বেঁধে রেখেছেন—

শঙ্কর॥ (ধম্‌কাইয়া) কি? আমি কড়ি বেঁধেছি—

[ইতিমধ্যে গজানন আসে ও বলে]

গজানন ॥ কি? ব্যাপার কি? চেঁচামেচি কিসের?

বামন ॥ দেখুন না গড়গড়ি বাবা! ওঁর মালা বাঁধা হুঁকোয় কে কড়ি বেঁধে রেখেছে—আর আমায় উনি শুধু শুধু শাপমুন্যি করছেন।

গজানন ॥ ওকে শুধু শুধু শাপমুন্যি করছ কেন গোঁসাই? তোমার ঐ মালা বাঁধা হুঁকোয় কড়িটা আমিই বেঁধে রেখেছি—

শঙ্কর ॥ কি? তুই বেঁধেছিস?

গজানন ॥ হ্যাঁ, বেঁধেছি। বেশ করেছি। হুঁকোর গলায় মালা ঝুলিয়ে, এখানে ন্যাকামো করা চলবে না। যে মন্দিরে কাজ করছো—সেখানে শ্যামার পাশে শ্যাম, আবার শ্যামের পাশে শ্যামা। মালা বাঁধ্‌লে, কড়িও তোমায় বাঁধতে হবে।

গণেশ ॥ বা! বা! বেশ বলেছ গড়গড়ি, বেশ বলেছ—

শঙ্কর ॥ কি? বেশ বলেছে? ও! বুঝেছি, ওর সঙ্গে তোমারও যোগসাজস্‌ আছে। আচ্ছা, আমি দেখে নেব।

গজানন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিও।

[প্রস্থান]

শঙ্কর ॥ বাম্‌না—এখনো বলছি—হুঁকোর কড়ি খুলে দে—

বামন ॥ আমি ওসব পারবো না। আমি বাঁধিও নি আমি খুলবোও না।

[প্রস্থানোদ্যত]

শঙ্কর ॥ দেখ চক্কোত্তি, চাকরের আস্পর্দ্ধাটা একবার দেখ—

ঘনশ্যাম ॥ এই বাম্‌না, গোঁসাই যা বলছে তাই করনা, কড়িটা খুলে দে—

বামন ॥ আমি পারবো না। কড়ি খুলে দিয়ে শেষে গড়গড়ি বাবার হাতে প্রাণ দিই আর কি—বাবা, আমার যে সে নয়—যেন, জ্যান্ত মহিষাসুর !

[বামনদাসের কথা শুনিয়া শঙ্কর ঘনশ্যামের মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে। ঘনশ্যাম বলে]

ঘনশ্যাম ॥ আর ঘেঁটিয়ে কাজ নেই, চেপে যাও—

সপ্তম দৃশ্য

[ভবতারিণীর মন্দির। রামকৃষ্ণ মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়াছিলেন। অদূরে হৃদয় চন্দনপাটায় চন্দন ঘষিতেছিল। রামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীর পায়ে আঙ্গুলের চাপ দিয়া কি যেন দেখিতেছিলেন]

হৃদয় ॥ নাও মামা, চন্দন ঘষে দিয়েছি—এবার পূজোয় বসো।

[রামকৃষ্ণ নিরুত্তর]

ও কি করছো মামা—প্রতিমার পায়ে চাপ দিচ্ছ কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ দেখছি, পায়ে টোল্ খায় কি না।

হৃদয় ॥ নাঃ! সত্যিই তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে—নাও, পূজোয় বোস।

রামকৃষ্ণ। যতক্ষণ না প্রতিমার প্রাণ আন্‌তে পারবো, ততক্ষণ আজ আর কিছুতেই পূজোয় বসবো না হৃদে।

হৃদয় ॥ তা বসবে কেন? বড় মামা অত করে শিখিয়ে পড়িয়ে গেল—আর পিছন ফিরতেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করলে !

[সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিমার চোখের কাছে রামকৃষ্ণ আঙ্গুল নাড়িতে লাগিলেন]

হৃদয় ॥ ও কি মামা! কি হোল—উঠে দাঁড়ালে কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ দেখছি মায়ের চোখের পল্লব নড়ছে কি না! মার কাছ থেকে সাড়া না পাওয়া পর্য্যন্ত আজ আর পূজো হবে না হৃদে—আজ আমি মাকে দেখবো।

হৃদয়। কি পাগলামী কচ্ছো মামা—শুনছি মন্দিরে সেজবাবু এসেছেন।

রামকৃষ্ণ ॥ কে সেজ বাবু? আমাদের মায়ে ছেলের বোঝাপড়া—এরমধ্যে সেজ বাবুকে ভয় করতে যাবো কেন?

হৃদয় ॥ তবে যা খুসী করো—এই নাও চন্দন রইলো—

[হৃদয় বিরক্তভাবে চলিয়া গেল—রামকৃষ্ণ প্রতিমার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ দেখা দে মা—দেখা দে—তুই তো প্রাণহীনা পাষাণী নস্—রামপ্রসাদ যে তোর দেখা পেয়েছিল মা—ঐ পাথরের হাত দিয়েই তো তুই কমলাকান্তের চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিলি। আমিও তো তোর সন্তান—তবে আমাকেই বা দেখা দিবি না কেন মা?

[সহসা ব্যাকুলকণ্ঠে রামকৃষ্ণ গাহিতে থাকেন]

ওমা কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও মা জননী!
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী মা—
তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালরূপা কামিনী॥
কভু কমলের কমলে নাচ মা, ওমা পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনী॥
দেখা দাও মা, দেখা দাও মা, দেখা দাও॥

[উপরোক্ত গানের মাঝে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া মথুরবাবু মন্দিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়ান। রামকৃষ্ণের কাতর প্রার্থনায় তিনিও মুগ্ধ হন। তিনি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন]

রামকৃষ্ণ ॥ কই ? এখনো তোর দয়া হোল না—এখনো তুই দেখা দিবি না—?

[সজোরে প্রতিমাকে ধরিয়া রামকৃষ্ণ নাড়া দিতে থাকেন]

ঘনশ্যাম ॥ (উত্তেজিতভাবে বলিয়া বসে) সেজবাবু, পাগ্‌লটা প্রতিমা উল্‌টে ফেলবে নাকি ? কোথায় গেল ওর ভাগ্‌নে সেই হৃদয়রাম—

মথুর ॥ (বিরক্তভাবে) আঃ ! চলে আসুন আমার সঙ্গে—

[মথুর ঘনশ্যামকে লইয়া চলিয়া যান]

রামকৃষ্ণ ॥ দয়া হোল না মা—রাত দিন তোর পায়ে মাথা খুঁড়ছি, তবুও তোর দয়া হোল না—দেখাই যখন দিলি না—তখন এ ছার প্রাণ আর রাখতে চাই না—

[সহসা উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যস্থলের খাঁড়াটি লইয়া বলিলেন]

—যদি দেখাই না দিলি—তা হোলে এ প্রাণ নিয়ে বেঁচে থেকে কি করবো ? নে রাক্ষুসী, তুই রক্ত নে—তোর পায়ে পড়ে থাক আমার এ মাথা—

[খড়্গা তুলিয়া নিজ স্কন্ধে মারিতে যাইবেন—সহসা এক জ্যোতির্ম্ময়ী কিশোরীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তিনি খড়্গটি হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া অদৃশ্য হইলেন। ধীরে ধীরে পর্দ্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণীর মন্দিরের একাংশ। রাণী রাসমণি ও মথুর কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করেন। পেছনে হরি চৌকিদার]

মথুর ॥ জমি ঘিরে নিয়েছে বোলে সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা ঠাকুর মশায়ের নামে অভিযোগ কোরেছে। কিন্তু নিজের চোখে দেখলেন তো মা—মায়ের পীঠস্থানে ভট্‌চায্যি মশায় পঞ্চবটী রোপন কোরেছেন। এখানে এটেরই অভাব ছিল। সে অভাবটিও পূর্ণ ক'রেছেন মা ভবতারিণীর পূজারী। খাজাঞ্চীখানার কর্ম্মচারীরা পূজারীর নামে বাঁশ চুরির অপবাদ পর্য্যন্ত চাপিয়েছে, অথচ শুনলেন তো হরির মুখে—পঞ্চবটীর আসন ঘিরতে বাঁশগুলো নাকি আপনিই গঙ্গায় ভেসে এসেছিল।

রাসমণি ॥ হাঁসপুকুরের ও দিকটায় বাঁশের খুঁটি পাহাড় পর্ব্বত সমান জমে রয়েছে—অথচ সেখান থেকে ভট্‌চায্যি মশায় একটি বাঁশও নেন নি। মায়ের আসন যেখানে হবে—মা নিজেই তার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।

মথুর ॥ সে কথা ঠিক মা। অথচ কেন যে এরা এই সরল সাদাসিধে মানুষটিকে ভাল চোখে দেখতে পারছে না—জানি না।

রাসমণি ॥ সাধারণ মানুষের যিনি ব্যতিক্রম—তাঁকেই ত বহু মানুষের অনন্ত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় বাবা।

মথুর ॥ তা যা বোলেছেন মা!

রাসমণি ॥ চল বাবা।

[রাসমণি ও মথুর নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরি তাঁহাদের অনুসরণ করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভবতারিণীর মন্দির। তখন সন্ধ্যা—রামকৃষ্ণ মায়ের পূজায় বসিয়াছেন। চারিদিকে কাঁসর ঘন্টা বাজিতেছে। দূরে শানাই বাজিতেছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে হৃদয় চন্দন ঘষিতেছে। রামকৃষ্ণ সহসা কুসী হইতে জল লইয়া মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়া বলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ নাও মা নাও—

[পরক্ষণে একমুঠো ফুল থালা হইতে তুলিয়া লইয়া স্বীয় মস্তকে রাখিয়া বলিলেন]

—দাও মা—দাও—

[ফুলের সাজি হইতে একগাছা মোটা গোড়ের মালা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গোড়ের মালাটি কালিকা মূর্ত্তির গলায় পরাইতে গিয়া নিজের গলায় পরিলেন এবং বলিলেন]

—পরো মা—পরো—

[রামকৃষ্ণের এইরকম পূজার ব্যাপারে হৃদয় আজ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল—রামকৃষ্ণের পূজা কেহ দেখিতেছে কিনা! মালা গলায় দিয়া রামকৃষ্ণ আসনে বসিলেন। নৈবেদ্য হইতে একটি মিষ্টান্ন লইয়া দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন]

খাও মা—খাও।—কি খাবে না? ও! আমি খাব—আচ্ছা—এই খেলাম, এবার তুই খা—

[হৃদয় আর থাকিতে পারিল না—বলিল]

হৃদয় ॥ আঃ—মামা কচ্ছো কি? রাণীমা আসছেন সরজমিনে তদন্ত কোরতে।

রামকৃষ্ণ ॥ কি কোরতে ?

হৃদয় ॥ তদন্ত কোরতে—পূজো ঠিকমত হচ্ছে কি না তাই দেখতে।

রামকৃষ্ণ ॥ ঠিকমত পূজোই তো করছি—মাকে খাওয়াচ্ছি, পরাচ্ছি, সাজাচ্ছি—

হৃদয় ॥ তোমার মাথা করছো—সাজাতে গিয়ে নিজে সাজছো—খাওয়াতে গিয়ে নিজে খাচ্ছো।

রামকৃষ্ণ ॥ কি করি বল্। আমি না খেলে মা যে খায় মা হৃদু—সন্তানকে উপোসী রেখে মা কি খেতে পারে রে ?

হৃদয়। ও সব পাগলামী কথা রাখ। আসনে বোসে—মন দিয়ে পূজো করো—রাণী মা তেড়ে আসছেন। এই রকম পাগলামী করতে দেখলে রাণী মা আর রাখবেন না—দূর করে তাড়িয়ে দেবেন।

রামকৃষ্ণ ॥ তাড়িয়ে দেবে ?—তাড়াবে কেন ?

হৃদয় ॥ তাড়াবে না তো কি ? তোমায় মুখ দেখে মাইনে দেবে ?—না পূজোর নামে পাগলামী সহ্য করবে ?

রামকৃষ্ণ ॥ তাড়াবি মা ! হৃদু বলছে রাণীমা নাকি তেড়ে আসছে—কিন্তু তোকে ছেড়ে যে আমি কোথাও থাকতে পারবো না—

[সহসা হরি চৌকিদারের কণ্ঠ শোনা গেল]

হরি ॥ এই হুঁসিয়ার—রাণীমা।

[রাণীমার আগমন বার্তায় হৃদয় ভয়ে পলাইল। রামকৃষ্ণ ব্যস্তভাবে মাতৃমূর্ত্তির আড়ালে লুকাইলেন। ইতিমধ্যে মথুরের সহিত রাসমণি মন্দিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন]

রাসমণি ॥ এ কি মথুর !—পূজারী আসনে নেই ! কোথায় গেলেন ছোট ভট্‌চায্যি মশায় ?

মথুর ॥ [সবিস্ময়ে]—তাই তো !

হরি ॥ আজ্ঞে এই মাত্র তো আমরা দেখে গেলাম—ঠাকুর মশায় পূজো করছিলেন।

রাসমণি ॥ দেখ তো বিষ্ণু ঘরে, কি ওঁর নিজের ঘরে আছেন কি না ?

[হরির প্রস্থান]

রাসমণি ॥ মাকে বড় সুন্দর করে সাজান কিন্তু।

মথুর ॥ হ্যাঁ মা, কোথাও ত্রুটি নেই,—না সাজসজ্জায় না পূজোয় (সহসা চমকাইয়া)—ওকি ?

রাসমণি ॥ কি মথুর !

মথুর ॥ ঐ দেখুন মা—ছোট ভট্‌চায্যি মশায় মাতৃমূর্ত্তির আড়ালে ভয়ে জড়সড় হোয়ে লুকিয়ে রয়েছেন !

রাসমণি ॥ (দেখিয়া—সস্নেহে রামকৃষ্ণের প্রতি)—ওকি ? ওখানে কেন বাবা ?

রামকৃষ্ণ ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে)—ওকে বল্ না মা—ও যে তাড়িয়ে দেবে বোলে তেড়ে এসেছে, তুই বল্ মা, নইলে আমাকে যে এখুনি ঘাড় ধোরে তাড়িয়ে দেবে।

রাসমণি ॥ মথুর, কেন আত্মভোলা পূজারী আত্মগোপন কোরে আছেন বুঝতে পারছো ?

মথুর ॥ হ্যাঁ মা ! কিন্তু কে তাড়িয়ে দেবে বোলেছে—কিছু তো বুঝতে পারছি না।

রাসমণি ॥ ওখানে কেন বাবা—এদিকে আসুন।

রামকৃষ্ণ ॥ যাবো না তো—

রাসমণি ॥ কেন বাবা ?

রামকৃষ্ণ ॥ বলো আগে তাড়িয়ে দেবে না—

রাসমণি ॥ কে কাকে তাড়াবে বাবা ?—এসো ভয় কি ?

[রাসমণির স্নেহসম্ভাষণে রামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে মন্দিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাসমণি মথুরকে বলেন]

রাসমণি ॥ মথুর তুমি সবাইকে বোলে দাও, তাড়াবার যদি কাউকে দরকার হয় তা হোলে আমিই তাড়াব। এ নিয়ে কোন কর্ম্মচারী যেন ছোট ভট্‌চাষ্যি মশাইকে কোন রকম কথা না বলে। ভবিষ্যতে এ রকম কথা যেন কারুর মুখে কোনদিন না শুনি।

মথুর ॥ আচ্ছা মা আমি এখুনি সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি—

[মথুর চলিয়া গেলেন। রাসমণি মন্দিরের দরজায় বসিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক ভক্ত আসিয়া দাঁড়াইল। রামকৃষ্ণ বলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ আয় বোস্। এবার একটু মায়ের নাম শোনা তো! আমার রাণীমা মায়ের নাম শুনতে ভারী ভালবাসে।

রাসমণি। সত্যি মায়ের নাম গান আমি খুব ভালবাসি।

রামকৃষ্ণ ॥ বাসবে বৈ কি গো—তুমি যে অষ্ট নায়িকার এক নায়িকা—নে গা।

[ভক্ত কালীকীর্ত্তন সুরু করিলেন]

জয় কালী জয় কালী বলে, যদি আমার প্রাণ যায়
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারানসী তায়
অনন্তরূপিণী কালী কালীর অন্ত কেবা পায়—
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে, শিব পড়েছেন রাঙা পায় ॥

[রামকৃষ্ণ উপরোক্ত নামগান শুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। রাসমণি তন্ময়

হইয়া চক্ষু বুঁজিয়া সেই নামগান শুনিতেছিলেন। সহসা গানের মাঝে রামকৃষ্ণ সশব্দে রাসমণির পিঠে চপেটাঘাত করিয়া বসেন]

রামকৃষ্ণ॥ এখানে এসেও ওই ভাবনা ?

[দাসদাসী, চৌকিদাররা ছুটিয়া আসিল ও সমস্বরে বলিল]

—কি এত বড় আস্পর্দ্ধা ?

—রাণীমার গায়ে হাত !

—পুরুতের মাথা ভাঙ্গবো।

[মন্দিরের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে বহু লোক জড় হইয়া গেল। মথুরও ব্যস্ত হইয়া সেখানে আসিয়া পৌছাইলেন। হরিও পশ্চাতে আসিল। রামকৃষ্ণ ভয়ে পুনরায় মাতৃমূর্ত্তির পশ্চাতে লুকাইলেন। রাসমণি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিলেন]

রাসমণি॥ হরি—

হরি॥ হাজির রাণীমা—

রাসমণি। এদের এখান থেকে যেতে বল্—ওরা কি জন্যে ছুটে এসেছে এখানে ?

[জনতা ক্রমশঃ অপসারিত হইল। রাসমণি হরিকে হুকুম করিলেন]

রাসমণি॥ আজ থেকে আমার হোয়ে তুই দিন রাত ছোট ভট্‌চাযি্যকে দেখবি—দেখিস্ যেন ওঁর গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত না লাগে।

হরি॥ যে আজ্ঞে মা।

[হরি চলিয়া গেল]

মথুর॥ যা শুনলাম তা কি সত্যি মা ?

রাসমণি ॥ সত্যি। আমি ভাবছি মথুর আমার মনের খবর ছোট ভট্‌চায্যি মশায় পেলেন কি কোরে? মায়ের মন্দিরে এসে—মায়ের সামনে বোসে —মায়ের নামগান শুনতে শুনতে কালকে হাইকোর্টে যে মামলাটা আছে, তার কথাই আমি ভাবছিলাম। ছোট ভট্‌চায্যি মশায় তাইতো আমায় ভৎর্সনা করেছেন—ছি—ছি—, এ মন নিয়ে মন্দিরে আসাই বা কেন— আর মায়ের নাম গান শোনাই বা কেন? কি লজ্জা—

মথুর ॥ তাই বোলে গায়ে হাত—

রাসমণি ॥ গায়ে হাত তোলার অধিকার যে শুধু ওঁরই আছে মথুর। আমি যে ইহকাল পরকালের সব দায়িত্বই ওঁর হাতে তুলে দিয়েছি। তুমি দেখো বাবা পাগল ছেলেটার উপর কেউ যেন জুলুম না করে। তা হোলে এই গোটা দক্ষিণেশ্বর গঙ্গায় ডুবে যাবে।

তৃতীয় দৃশ্য

[কামারপুকুর। রামকৃষ্ণের দেশের বাড়ী। দু' পাশে দুখানি আটচালা—মধ্যস্থলে উঠান। তাহার একপাশে তুলসীমঞ্চ। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। রামেশ্বরের স্ত্রী ঘর হইতে উঠানে নামিলেন—তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া শঙ্খ বাজাইলেন পরে তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন—এমন সময় চিন্তিত মনে রামেশ্বর সেখানে প্রবেশ করিলেন। রামেশ্বরের স্ত্রী স্বামীর ভাবান্তর দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন]

মেজ বউ ॥ কি গো এতো দেরী করে ফিরলে যে? রঘুবীরের শীতল দেওয়ার সময় হোল।

রামেশ্বর ॥ মনটা আজ আর ভাল নেই মেজ বউ—আন্‌মনা হোয়ে সারাদিন পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রঘুবীরের শীতল দেওয়ার কথা মনেই ছিল না।

মেজ বউ ॥ কেন? কি হয়েছে কি?

রামেশ্বর ॥ দক্ষিণেশ্বর থেকে গদাইয়ের খবর এসেছে—তার নাকি মাথার গোলমাল হয়েছে।

মেজ বউ ॥ সে কি গো!

রামেশ্বর ॥ হ্যাঁ। দাদা চলে গেলেন—গদাইয়ের ঐ অবস্থা—আমি যে মাকে নিয়ে এখন কি করবো—কি যে বলবো তাঁকে, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না—

মেজ বউ ॥ মাকে ওসব কথা না বলাই ভাল—এই সেদিন এতবড় শোক পেয়েছেন—তার ওপর আবার ঠাকুরপোর এই কথা শুনলে তিনি আর বাঁচবেন না।

রামেশ্বর ॥ কিন্তু এ দুঃসংবাদটা মার কাছে গোপন করি কি করে? হৃদয় জানিয়েছে অনেক চিকিৎসা হচ্ছে, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না! এ অবস্থায় তাকে ওখানে না রেখে, আমি ভাবছি বাড়ী নিয়ে আসাই ভাল।

মেজ বউ ॥ বেশ তো, তাই নিয়ে এস না।

রামেশ্বর ॥ বাড়ীতেই যদি নিয়ে আসতে হয়, তাহলে মাকে কথাটা গোপন কোরে লাভ নেই মেজ বউ।

মেজ বউ ॥ ঠাকুরপো চিরকালই একটু আত্মভোলা মানুষ!

রামেশ্বর ॥ শুধু আত্মভোলা নয় মেজ বউ—এখন নাকি সাধন ভজন নিয়ে দিন-রাত থাকে। ওর ভাব গতিক দেখে দাদাও ভয় পেয়েছিলেন। পাছে ওর কোন অনিষ্ট হয়, তাই দেশে আসার কদিন আগে দাদা তাকে এক তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষা দিয়েছিলেন। হৃদয় জানিয়েছে এখন আর

নাওয়া খাওয়ার কথাটাও মনে থাকে না। কখনও "মা—মা" বোলে কাঁদতে কাঁদতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে—কখনও বা "রঘুবীর" "রঘুবীর" বলে ছোটাছুটি করে।

মেজ বউ॥ ঠাকুরপোকে দেশে নিয়ে এসে, বিয়ে থাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করলে, হয় তো এ ভাবটা কেটে যেতে পারে।

রামেশ্বর॥ কিন্তু এ রকম অবস্থায় তা কি সম্ভব ?

মেজ বউ॥ আমার মনে হয় বট্‌ঠাকুরের শোকেই ঠাকুরপো আরও এ রকম হোয়ে গেছে।

[ইতিমধ্যে চন্দ্রমণি সেখানে প্রবেশ করেন]

চন্দ্রমণি॥ কিরে রামু—সন্ধ্যে হোয়ে গেল, রঘুবীরের শেতল দিলিনে যে বাবা ?

রামেশ্বর॥ এই যে যাই মা—

চন্দ্রমণি॥ আজ সারাদিনের ভেতর মুখখানি একবারও দেখতে পাই নি—কোথায় ছিলি বাবা ?

রামেশ্বর॥ এই কাছেপিঠেই ছিলাম মা।

চন্দ্রমণি॥ হ্যাঁরে, মুখখানা শুকিয়ে গেছে—বলি, শরীর-টরীর খারাপ হয় নি তো ?

রামেশ্বর॥ না—না, শরীর খারাপ হবে কেন ?

চন্দ্রমণি॥ তবে চোখ মুখ অমন থম্‌থমে, ভারি ভারি কেন ?

রামেশ্বর॥ চোখের ভুল মা—সারাদিন দেখনি, তাই ভাবছ থম্‌থমে ভারি ভারি—

চন্দ্রমণি॥ কি জানি—আমার যা কপাল। হ্যাঁরে, গদাইয়ের কোন খবর পেয়েছিস্ ? ক্ষ্যাপা পাগল ছেলে, বিদেশ বিভুঁয়ে আছে—ওর জন্মেই আমার ভয় ভাবনা—

মেজ বউ ॥ এইবার ঠাকুরপোর একটা বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন মা—

চন্দ্রমণি ॥ কিন্তু ও কি বিয়ে করতে রাজী হবে—

মেজ বউ ॥ আপনার ছেলেকে বলুন দেশে আসবার জন্যে খবর দিতে, তারপর ঠাকুরপোকে বোলে ক'য়ে আমিই রাজী করাবো।

চন্দ্রমণি। তা মেজ বউ মা মন্দ বলে নি রামু। তুই বরং গদাইকে দিন কতক ছুটী নিয়ে আসতে লিকে দে।

রামেশ্বর ॥ হ্যাঁ—আমিও তাই মনে করছিলাম মা। হৃদয় খবর পাঠিয়েছে—গদাইয়ের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না।

চন্দ্রমণি ॥ সে কি! কি হয়েছে তার?

রামেশ্বর ॥ হৃদয় জানিয়েছে, বায়ু বৃদ্ধি হয়েছে। পূজো করতে বসে "মা—মা" কোরে চীৎকার করে—কাঁদে। থেকে থেকে অজ্ঞানের মতন হোয়ে যায়।

চন্দ্রমণি ॥ ছেলে বয়েস থেকেই ওর ওই রোগ। সেই জন্যেই তো ওর জন্যে এত ভয় ভাবনা বাবা। বারোয়ারী তলার যাত্রায় শিব সেজে তিন দিন অচৈতন্য হোয়ে পড়েছিল। যেদিন থেকে ওকে পেটে ধরেছি, সেই দিন থেকেই ওর জন্যে আমার নানান চিন্তা, উনিও ওর ভাবনা ভাবতে ভাবতে গেছেন, রামকুমারও শেষ দিন পর্য্যন্ত ওর ভাবনা ভেবেই গেলো। উনি বলতেন—'ওকে ওর ইচ্ছামত পথেই ছেড়ে দিও—ওকে বাধা দিতে যেও না—বাধা ও মানবে না—বাঁধন ও কেটে ফেলবে। তাই তাঁর কথা যখন মনে হয়,—তখন বাঁধন কাটার ভয়েতে আমি আড়ষ্ট হোয়ে থাকি। শরীরটা যখন ভাল নেই তখন ওকে আসতেই লিখে দে।

রামেশ্বর ॥ আচ্ছা মা!

চন্দ্রমণি ॥ (প্রস্থানোদ্যত ফিরিয়া) আর এতখানি পথ যেন সে একা না

আসে। একা আসতে গিয়ে রামকুমার আমার পথের মাঝে প্রাণ হারালো—বাড়ী এসে পৌঁছুলো না। হৃদয়কে নিখে দে রামু ওকে যেন একা ছেড়ে না দেয়—একা ছেড়ে না দেয়—

চতুর্থ দৃশ্য

[খাজাঞ্চীখানা। শঙ্কর গোঁসাই ও অপর কয়েক-জন কর্ম্মচারী কাজে ব্যস্ত। শঙ্কর গোঁসাই বলে]

শঙ্কর ॥ বলি কি রকম বুঝছ হে ?

ঘনশ্যাম ॥ কিসের কি ?

শঙ্কর ॥ ছোট ভট্‌চায্যির কথা বলছি গো। রাণীমাকে চড় কষিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যে দেশে পালাল।

গজানন ॥ তাই নাকি ? কই ? দেশে যাওয়ার কথা ত কিছু শুনিনি ?

শঙ্কর ॥ তা শুনবে কেন ? কেবল খাতার পাতায় আঁক কষবে আর প্রসাদের কাঁড়ি গিলবে।

গজানন ॥ তা ত গিল্‌বো। মায়ের মন্দিরে পড়ে আছি যখন প্রসাদ পাব না ? আমরা না হয় মায়ের ঘরের প্রসাদ পাই। বলি, গোবিন্দ ঘরের প্রসাদ তুমি গেলো না ?

শঙ্কর ॥ গোবিন্দর প্রসাদ গ্রহণের আমিই একমাত্র অধিকারী—

গজানন ॥ তুমি শুধু গোবিন্দর প্রসাদের অধিকারী—আমরা শ্যাম-শ্যামা দুইয়েরই প্রসাদের অধিকারী।

শঙ্কর ॥ ও! তুই ত অনেক দূর এগিয়েছিস্ রে। ছোট ভট্‌চায্যির মত শ্যাম-শ্যামা আরম্ভ করেছিস্।

গজানন ॥ তবে ? তোমার মত তেলক কেটে কি দিনরাত লোকের কুচ্ছো গাইবো ?

শঙ্কর ॥ মুখ সাম্‌লে কথা কইবি গড়গড়ি ? কি ? আমি দিনরাত লোকের কুচ্ছো গেয়ে বেড়াই ?

গজানন ॥ বেড়াও বৈ কি ! দিনরাতই তো ছোট ভট্‌চাযি্যর কুচ্ছো গাইছো—ভট্‌চাযি্য এখন নেই, দেশে গেছে—কাজ কর্ম্ম ফেলে সাত-সকালে তাই নিয়ে আরম্ভ করলে।

শঙ্কর ॥ করবো না ? নিশ্চয় করবো—বলি, চাকরের এতবড় আস্পর্দ্ধা—যে মনিবের গায়ে হাত তোলে ?

গজানন ॥ মনিবের ব্যাপার মনিব বুঝবে। তুমি চাকর চাকরের মত থাক। মনিব রইলো চুপ করে আর উনি করছেন মোড়লী। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

শঙ্কর ॥ দেখ—গড়গড়ি, আমি জাত সাপ—গোস্বামী সন্তান। আমার সঙ্গে বেশী ওস্তাদি করতে আসিস্ না।

গজানন ॥ যাও যাও তোমার মত অনেক গোসাপ আমি দেখেছি।

ঘনশ্যাম ॥ কথা না বলে আমিও পারি না গড়গড়ি ! আচ্ছা গোঁসাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার। তুমিই বা তাতে ফোঁড়ন কাটতে এলে কেন ?

গজানন ॥ একশো বার ফোড়ন কাটবো—এটা কাজের জায়গা—কুচ্ছো করার জায়গা নয়।

শঙ্কর ॥ ওরে আমার কাজের মানুষ রে। কাজ দেখাচ্ছে।

গজানন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার মত অমন করিনে—পুরুতে কবার হাত ঘুরিয়ে আরতি করলো—তার হিসেব রাখতে যাইনে—দস্তুরমত দুই আর দুইয়ে চার করি—

[বেগে প্রস্থান]

শঙ্কর ॥ আস্পর্দ্ধার কথাটা শুনলে। আমরা বুঝি তুই আর তুইয়ে পাঁচ করি? আমি বলে রাখছি চক্কোত্তি—ওর কি হয় তুমি দেখে নিও —আমার পেছনে লাগতে আসে? জানে না আমি গোস্বামী সন্তান— এক নিমিষে গড়গড়িকে আমি গড়াগড়ি খাওয়াতে পারি।

ঘনশ্যাম ॥ বাদ দাও দাদা। বাদ দাও ওর কথা। ও কি আবার একটা মানুষ নাকি! তারপর ছোট ভট্‌চায্যির ব্যাপার কি শুনলে বল দিকি?

শঙ্কর ॥ ব্যাপার আর কি? ও পাগল সেজে থাকে—আসলে কিন্তু ও বেশ সেয়ানা। রাণীকে চড় কষিয়ে দেখলে কাজটা অন্যায় হয়ে গিয়েছে অমনি পাগলামীর মাত্রা বাড়িয়ে দিলে। সেজবাবুকে ঐ হৃদয় ষণ্ডটা বোঝালে, ওর মাথা একেবারেই খারাপ হোয়ে গেছে—ওকে বাড়ী নিয়ে যাই—আরে বাবা আমি গোস্বামী সন্তান আমার চোখে ধুলো দিবি? দেশে পৌঁছে হৃদয় সেজবাবুকে কি চিঠি দিয়েছে জান?

ঘনশ্যাম ॥ কৈ? না ত। কি লিখেছে?

শঙ্কর ॥ লিখেছে, ছোট ভট্‌চায্যির বিয়ে। সত্যিকারের পাগল হলে তার কি কেউ বিয়ে দেয়?

ঘনশ্যাম ॥ ঠিকই তো! অন্যায় করেছিস্ কোথায় মাপ চেয়ে চিঠি লিখ্‌বি—তা নয়, পাঠালি কি না নেমতন্ন চিঠি!

শঙ্কর ॥ তবেই বোঝ পেটে পেটে কি শয়তানি বুদ্ধি। বুঝলে চক্কোত্তি আমাদের গাঁয়ে এক বুড়ো ছিল অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। ছেলেরাও বেশ রোজগার করতো। কিন্তু ঐ বুড়োর এক দোষ ছিল কিছুতেই রেলের ভাড়া দিত না। কোথাও যেতে হলে বিনে টিকেটেই রেলে চেপে বস্‌তো। তারপর যেখানে যাবে সেখানে টুপ্ করে নেমে পড়েই কান্না সুরু করত—"কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম!" রেলের টিকেট-

বাবু বুড়ো মানুষ ভুল করেছে ভেবে ছেড়ে দিতো তারপর বুড়ো ইষ্টিশন থেকে নেমে নিজের কাজকর্ম্ম সেরে পরের গাড়ীতে বাড়ী ফিরে আসতো! এরও হয়েছে তাই। এখানে একটু মাথার ছিট দেখিয়ে, দেশে গিয়ে বিয়ের ফুল ছিটোচ্ছে।

ঘনশ্যাম ॥ (শঙ্করের কথার মাঝে দরজার দিকে চাহিয়া বলে) গোঁসাই! নোতুন পূজোরী ঠাকুর যাচ্ছে, ডেকে দেখা যাক না ওকি বলে—শুনেছি ওতো ছোট ভট্‌চাযিার জ্ঞাতি ভাই নাকি হয়—

শঙ্কর ॥ তাই নাকি? ডাক—ডাক—

[ঘনশ্যাম ব্যস্তসমস্তভাবে তক্তপোষ হইতে নামিয়া দরজার কাছে যাইয়া ডাকে]

ঘনশ্যাম ॥ ও—ও ভট্‌চাযিা মশাই— ও নোতুন ভট্‌চাযি মশায়!

[হলধারী দরজার কাছে আসিয়া বলেন]

হলধারী ॥ আমায় ডাকছেন?

ঘনশ্যাম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আসুন-আসুন! এতদিন মন্দিরে এসেছেন অথচ আলাপ সালাপের সুযোগ হয় নি। বসুন—তামাক খান। ওরে ও বামনা কোথায় গেলি—

[বামনদাস প্রবেশ করে]

—ভট্‌চাযিা মশায়কে তামাক দে—

[বামনদাস তামাক সাজিতে বসে]

—ছোট ভট্‌চাযিা অসুস্থ হয়ে দেশে গেলেন তারপর থেকে বহুদিন আমরা তাঁর কোন খোঁজ খবর পাইনি। শুনেছি আপনি ছোট ভট্‌চাযিার আত্মীয় নাকি, তাই ভাবলাম আপনাকে ডেকে কথাটা জিজ্ঞাসা করি।

হলধারী ॥ শুধু আত্মীয় নয়। গদাই আর আমি আপন জাঠতুত খুড়তুত ভাই—

[বামনদাস ইতিমধ্যে হুকা লইয়া আসে]

শঙ্কর ॥ দেখে শুনে হুঁকো দিস।

[হলধারী শঙ্করের কথায় ঘনশ্যামের মুখের দিকে চায়]

ঘনশ্যাম ॥ উনি গোস্বামী পরম বৈষ্ণব। ওঁর তুলসীকাঠের মালা বাঁধা আলাদা হুঁকো আছে কিনা—

হলধারী ॥ ওঃ কিন্তু আমিও তো বৈষ্ণব।

শঙ্কর ॥ (সবিস্ময়ে হলধারীর দিকে চাহিয়া থাকে) বৈষ্ণব! তাহলে বিষ্ণু-পূজো না করে শক্তি-পূজো করেন কেন?

হলধারী ॥ ব্যাপার কি জানেন যজন-যাজন আমাদের পৈতৃক ব্যবসা। গদাই অসুস্থ হয়ে দেশে গেল তাই তার কাজটা—

শঙ্কর ॥ আমরা ওরকম নই—কড়া বৈষ্ণব। লোকের কানে মন্ত্রদান করাই আমাদের কাজ।

হলধারী ॥ ও!

ঘনশ্যাম ॥ হ্যাঁ উনি বড় কড়া বৈষ্ণব। সু ও কু দুই মন্ত্রই উনি দিয়ে থাকেন। তা যাক্ ছোট ভট্‌চাযি্য মশায় এখন আছেন কেমন?

হলধারী ॥ বিশেষ সুবিধের নয়।

শঙ্কর ॥ থাকবার কথাও নয়। উগ্রসাধনা করতে গিয়ে উন্মাদ রোগ দেখা দিয়েছে।

হলধারী ॥ তবে ব্যাপার কি জানেন? ছোট বয়েস থেকেই ও একটু খ্যাপাটে খ্যাপাটে, তার ওপর বড়দা মারা গেলেন। সেই শোকে ও যেন আরও কি রকম হয়ে গেল। আমার জ্যেঠামশায় যখন মারা যান গদাই তখন সাত বছরের ছেলে। বড়দার আদর যত্নেই তো মানুষ হয়েছে—

ঘনশ্যাম ॥ ও! তা বড় ভট্‌চাযি্য মশায়ের শরীরটা অবশ্য এখানে ভাল যাচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এমন কি হোল যে বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন না পথেই মারা গেলেন।

হলধারী ॥ সবই দৈবের খেলা নইলে এমনই বা হবে কেন ? তবে একথা ঠিক, বড়দা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দেহাবসান হতে আর বেশী দেরী নেই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বড়দার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তো—

শঙ্কর ॥ শুনেছি বটে। বাপের মত বড় ভাই, শোক অবশ্য হবারই কথা কিন্তু ভায়ের নাম করে কাঁদাকাটা কি শোক প্রকাশ করা কিছুই তো করতে দেখলাম না কোনদিন। শুধু কাপড়টা কোমরে লেজের মত জড়িয়ে রঘুবীর রঘুবীর বলে উন্মাদের মত এগাছ থেকে ও গাছ লাফালাফি সুরু করলে।

হলধারী ॥ হ্যাঁ গদাইয়ের ও অবস্থা আমিও দেখেছি বটে—

শঙ্কর ॥ দেখেছেন একেবারে উন্মাদ অবস্থা—

ঘনশ্যাম ॥ না-না উন্মাদ নয় গোঁসাই, ভূতে পাওয়া—

শঙ্কর ॥ ভূত ? তা হোতে পারে আমার মনে হয় গেছো ভূত—

ঘনশ্যাম ॥ সম্ভব। নইলে গাছে গাছেই বা লাফালাফি করবে কেন ? কিন্তু এ অবস্থায় বিয়ে থা দেওয়া কি উচিত ভটচার্য্যি মশাই ?

হলধারী ॥ বিয়ে !

ঘনশ্যাম ॥ সে কি ! আপনার ভাইয়ের বিয়ের খবর আপনি শোনেননি ? হৃদয়রাম দেশ থেকে চিঠি দিয়েছে যে—

হলধারী ॥ তাই নকি ?

শঙ্কর ॥ বিয়ে দিয়ে তো ভূত তাড়ানো যাবে না ওঝা দেখাতে বলুন চণ্ড নামানোর ব্যবস্থা করুন—

হলধারী ॥ আমি তো শুনেছি ওঝাই দেখানো হচ্ছে—

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তাই দেখান, বিয়ে দিয়ে আর বোঝা বাড়াবেন না।

ঘনশ্যাম ॥ যা বলেছ।

পঞ্চম দৃশ্য

[জানবাজার। রাসমণির শয়নকক্ষ। কিছুদিন হইতে রাণী রাসমণি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। রাণী এখন একেবারে শয্যাশায়ী। পালঙ্কে শুইয়া আছেন—তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরে সেজ জ্বলিতেছে। ইতিমধ্যে জগদম্বা দুধের বাটি লইয়া ঘরে প্রবেশ .করিল। রাসমণি তাহাকে দেখিয়া বলেন—]

রাসমণি॥ আবার কি আন্‌লি ?

জগদম্বা॥ দুধ।

রাসমণি॥ তোর যত্ন আত্তিতে আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি,—নিয়ে যা দুধের বাটি—আমি খাব না, খেতে চাই না।

জগদম্বা॥ তা রাগই কর—আর গালাগালিই দাও—দুধটুকু তোমাকে খেতেই হবে।

রাসমণি॥ খাব না যখন বলেছি—আজ আর আমি কিছুতেই খাব না।

জগদম্বা॥ কেন খাবে না শুনি ?

রাসমণি॥ আমার ইচ্ছে।

জগদম্বা॥ রোগীর ইচ্ছের ওপর বাড়ীর লোক চলবে না—বাড়ীর লোকের ইচ্ছের ওপর রোগীকে চলতে হবে।

রাসমণি॥ বাড়ীর লোক তুমি একা নও। বাড়ীতে আরও পাঁচটা লোক আছে, তাদের সকলকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে তোমার কথায় যে আমি উঠবো বসবো তা তুমি মনেও করো না।

জগদম্বা। তাদের ছেঁটে ফেলে দিতে তোমাকে তো কেউ বলে নি মা।

রাসমণি॥ মুখে না বলো, কাজে যা কচ্ছো তা মুখে বলারও বাড়া।

জগদম্বা॥ কি অন্যায় কাজটা করেছি আমায় বল।

রাসমণি॥ বিষয় আসয় নিয়ে কি দরকার ছিল তোমার পদ্মর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার ?

জগদম্বা॥ বিষয় আসয়ের কোন কথাই আমি দিদির কাছে তুলিনি। দিদিই বরং সকালে না হোক কতকগুলো কথা শোনালে। বল্‌লে, আমিই নাকি তোমার মন ভাঙ্গিয়েছি তোমার সেজ জামাই নাকি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরকে দিয়ে তুক্ গুণ করিয়েছে।

[ইতিমধ্যে পদ্মমণি ঘরে প্রবেশ করে। রাসমণির সহিত জগদম্বাকে কথা কহিতে দেখিয়া সে চলিয়া যাইতে যায় রাসমণি বাধা দিয়া বলেন]

রাসমণি॥ এ কি পদ্ম—ঘরে ঢুকেই চলে যাচ্ছিস যে ?

পদ্ম॥ তোমরা এখন কথা বলছো পরে আসবো।

রাসমণি॥ তোরা দুজনেই আমার পেটের মেয়ে। এমন কোন গোপন কথা নেই, যা এক মেয়েকে বলা যায় আর এক মেয়েকে বলা যায় না।

পদ্ম॥ কি জানি এক এক সময় তোমার এক চোখোমো দেখে মনে হয়—

রাসমণি॥ (ম্লান হেসে) তুই কি আমার সতীনঝি রে! যে এক চোখোমো করবো ?

পদ্ম॥ করছো দেখেই বলছি—না হলে বোলতাম না। তোমার সেজ জামাইও-জামাই আর বড় জামাইও-জামাই। কিন্তু বিষয় কর্ম্ম দেখা শুনো এ সব ব্যাপারে তো বড় জামাইকে ডাকও না একটিবার।

রাসমণি। রামচন্দ্র যে এ সব ব্যাপারে আসতেও চান না—নির্ঝঞ্ঝটে মানুষ, তাই জন্তে আমিও আর এ সব বিষয়ে ওঁকে বিরক্ত করি না।

পদ্ম॥ কিন্তু বিষয় আসয়ের হিসেব পত্র সকলকেই তোমার সমান ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত মা। একজনের সব কিছু নখদর্পণে থাকবে —আর একজন অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়াবে এটাও তো ঠিক নয়।

রাসমণি॥ বেশ, আমি মথুরকে ডেকে বলে দিচ্ছি, কাল থেকে যেন রামকেও সেরেস্তার কাজ কর্ম্ম বুঝিয়ে দেয়।

পদ্ম॥ থাক তার দরকার নেই মা তাতে হয়তো অশান্তি আরো বাড়বে।

জগদম্বা॥ অশান্তি বাড়বে কেন দিদি? বরং এক সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি দেখলে ভবিষ্যতে ভুল বোঝাবুঝি হবে না।

পদ্ম॥ ভুল বোঝানর আর বাকি রাখছ কি তোমরা? কোন পরামর্শ নেই, জিজ্ঞাসাবাদ নেই—যা ইচ্ছে তাই তো করছো। মার ঐ ঠাকুরবাড়ীই হয়েছে কাল।

রাসমণি॥ ও কথা বলিসনি পদ্ম, মার প্রত্যাদেশ পেয়ে আমি ঠাকুরবাড়ী করেছি—আমার ঐ টুকুই শান্তি আর সান্ত্বনা।

পদ্ম॥ তা বুঝেছি। ঠাকুরবাড়ীর ব্যাপারে যারা তোমার খোসামোদ করে চলেছে—তাদেরই তুমি মাথায় তুলে নিয়ে নাচছো। আমরা অত গোড়ে গোড় দিতেও পারবো না, আর বিষয় সম্পত্তি নিয়ে নয় ছয় করতেও পারবো না।

[পদ্ম বেগে প্রস্থান করিল]

জগদম্বা॥ শুনলে তো মা, দিদির কথাগুলো শুনলে তো?

রাসমণি॥ শুনেছি শুনেছি, আর শুনতে চাই না—তোরা যা, তোরা যা, আমায় একা থাকতে দে।

[জগদম্বা দুধের বাটী লইয়া দুঃখিত মনে চলিয়া যায়। রাসমণির দুই গণ্ড বহিয়া তখন অশ্রু ঝরিয়া পড়ে]

—মা গো, —মা ভবতারিণী পয়ার অশান্ত মনকে শান্ত করো মা।

[এমন সময় মথুর ঘরে প্রবেশ করেন]

মথুর ॥ আজ কেমন আছেন মা ?

রাসমণি ॥ ভালই আছি বাবা। বস।

মথুর ॥ দেখে তো ভাল বলে মনে হয় না। অথচ জিজ্ঞাসা করলেই বলেন ভাল আছি।

রাসমণি ॥ যাবার সময় নিজের ভাল ছাড়া আর সকলের ভাল দেখে যেতে চাই বাবা। তোমরা ভাল থাক, সুখে থাক, শান্তিতে থাক —এতেই আমার ভাল। এ ছাড়া আমার নিজস্ব কিছু ভাল আছে কি ? যাক, সায়েবের মামলার খবর কি ?

মথুর ॥ কাল রায় বেরোবে। মনে হয় আমরাই জিত্‌বো।

রাসমণি ॥ দেখ মা ভবতারিণী যদি মুখ রাখেন। এ মামলার সঙ্গে সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে মথুর। এ সম্মান শুধু আমার একার নয় সমস্ত বাঙ্গালী জাতির। আমাদের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমরা রাস্তা দিয়ে যেতে পারবো না—ইংরেজদের এ জুলুম আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। যদি আমাদের হার হয় তো বিলেত পর্য্যন্ত লড়বো।

মথুর ॥ বেশ। তাই হবে মা।

রাসমণি ॥ দেবোত্তর উইলের কতদূর কি করলে ?

মথুর ॥ ঐ যে ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দিয়ে দিনাজপুরের যে তিনটি তালুক কেনা হয়েছে, তা আপনার ইচ্ছামত ঠাকুরের নামে দেবোত্তর করার জন্যে এটর্নীকে বলেছি।

রাসমণি॥ হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি পার উইলটা করে ফেলার ব্যবস্থা কর। নিজের যা শরীরের অবস্থা, কবে আছি, কবে নেই। শুভ কাজটা শেষ করে যেতে না পারলে মরেও শান্তি পাব না আমি।—হ্যাঁ আর একটা কথা। ছোট ভট্‌চায্যি দেশে গিয়ে বিয়ে করেছেন শুনে আর একজনের ভাবনাও আমায় পেয়ে বসেছে।

মথুর॥ আর একজন? কার কথা বলছেন মা?

রাসমণি॥ ছোট ভট্‌চায্যি মশায়ের স্ত্রী, বৌমার কথা বলছিলাম।

মথুর॥ হ্যাঁ, ওঁর ভাগ্‌নে হৃদয় মুখুজ্জ্যে বিয়ের পর দেশ থেকে ফিরে এসে আমায় বলেছিলেন যে, ছোট ভট্‌চায্যি মশাইএর স্ত্রীটি নাকি নিতান্তই শিশু।

রাসমণি॥ হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। ছোট ভট্‌চায্যি মশায়ের মেজ দাদা পাত্রীর খোঁজ করছিলেন—তাই শুনে ছোট ভট্‌চায্যি বলেন, 'অত খোঁজাখোঁজির দরকার কি—পাত্রী তো কুটো বাঁধাই আছে।' গাছের প্রথম ফলটি লোকে কুটো বেঁধে রাখে, ভগবানকে নিবেদন করবে বলে। এও যেন তাই—সবই অলৌকিক মথুর। তাই ছোট্ট মেয়েটির জন্যেই আমি একটু কিছু করে দিয়ে যেতে চাই।

মথুর॥ বেশ তো মা, আপনি যেমন বলবেন, সেই রকমই হবে।

রাসমণি॥ আমার ইচ্ছে হাজার দশেক টাকার মতন একটা সম্পত্তি ছোট ভট্‌চায্যি মশায়ের নামে দানপত্র করে দি। ওঁর প্রাণ ঢালা সেবায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দিনের পর দিন ভক্ত সমাগম বেড়েই চলেছে। আমি থাকি আর না থাকি মথুর, তুমি ওঁকে দেখো বাবা, তুমি ওঁকে দেখ—

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর। এক পাশে সারি সারি শিবমন্দির। সম্মুখে প্রশস্ত খোলা জায়গা। অদূরে গঙ্গা। প্রায় দু' বছর পরে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দু বছরে তাঁহার দেহের বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেহ দিয়া যেন জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সাধনায় তিনি যে আরও বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন—তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। তিনি এক হাতে একটা টাকা আর এক হাতে একটু মাটি লইয়া আপন মনে দেখিতেছিলেন। পরে টাকা ও মাটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ যাক্—যাক্—যাক্—

[এমন সময় হৃদয় প্রবেশ করিয়া বলে]

হৃদয় ॥ মামা ও কি করলে? যা মাটি তাই টাকা বলে, টাকাটাও মাটির সঙ্গে গঙ্গার জলে ফেলে দিলে?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁরে। বলছিলাম কি, যা মাটি, তাই টাকা। যা টাকা, তাই মাটি—টাকা মাটি, মাটি টাকা।

হৃদয় ॥ কিন্তু ও দুটোই তো চাই।

রামকৃষ্ণ ॥ কি চাই? কাঞ্চন ছেড়ে কাচ? মতি ছেড়ে ফুঁকো দানা? দূর দূর আমি চাই না কিছু।

হৃদয় ॥ টাকা না হোলে খাওয়া পরা চলবে কি কোরে?

রামকৃষ্ণ ॥ মা যেমন কোরে চালাবে তেমনি চলবে।

হৃদয় ॥ দেখ মামা—বিয়ে থা করে প্রায় বছর দুই দেশে কাটিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরেছ। এখন মন দিয়ে কাজ কর্ম্ম কর।

রামকৃষ্ণ ॥ বুদ্ধিতে যা আসে তাই নিয়েই তো চলি।

হৃদয় ॥ এখন আর ও রকম বুদ্ধি নিয়ে চললে চলবে না—হাজার হোক বিয়ে থা করেছ।

রামকৃষ্ণ ॥ বিয়ে থা করেছি তাই কি? বলি নাচবো না ঢোলের বোল বাজাব?

হৃদয় ॥ নাচতেও হবে না—ঢোলের বোলও বাজাতে হবে না তোমায়। শুধু সংসারটা যাতে চলে যায় সেই ব্যবস্থা করলেই চলবে।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে হৃদে সংসার চালাবার মালিক তুইও নস্—আমিও নই—মার সংসার, মা-ই চালাবেন।

হৃদয় ॥ নাঃ ভেবেছিলাম এতদিন পরে দেশ ঘর থেকে এলে বেশ খানিকটা শুধরে আসবে, কিন্তু দেখছি তোমার কোন পরিবর্ত্তনই হয় নি।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই কি ভেবেছিলি রে শালা যে আমি বেশ মোটা গোল-গালটি হোয়ে আসবো। তা যাক্—একটা কথা বলি শোন হৃদু। হলধারী দাদা যেমনি পুজো করছে তেমনি করুক—ভাবছি, এ মাসের এ কটা দিন আর পূজোর ঘরে ঢুকবো না—

হৃদয় ॥ কেন? ওর চাকরী যাওয়ার ভয় করছো। তুমি থাকলেও ওর চাকরী যাবে না—সে কথা সেজবাবুর সঙ্গে হয়ে গেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ তাই নাকি? আমি এসে পর্য্যন্ত ঐ হলধারীর কথাটাই ভাবছিলাম।

হৃদয় ॥ শোন মামা, রাণীর বড় অসুখ। রোজই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। গিয়ে একবার তাঁকে দেখে এস।

রামকৃষ্ণ ॥ দেখে আর কি করবো ? তাকে তো আর ধরে রাখতে পারবো না।

[ইতিমধ্যে হলধারী প্রবেশ করেন]

হলধারী ॥ কি রে গদাই ? কাল রাত্রে এসেছিস্ অথচ কাল থেকে আজ এতখানি বেলা হোল, তোর সঙ্গে একবার দেখাও হোল না।

রামকৃষ্ণ ॥ কি করে দেখা হবে ? আমিও এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তুমিও পূজোর কাজে ব্যস্ত আছ।

হলধারী ॥ তারপর বাড়ীর সব কেমন আছেন বল ?

রামকৃষ্ণ ॥ ভাল।

হলধারী ॥ আমাদের বৌমাটি কেমন ?

রামকৃষ্ণ ॥ বাচ্চা জগদম্বা।

হলধারী ॥ বলিস্ কি ! তোর স্ত্রী যে ?

রামকৃষ্ণ ॥ তা সত্যি। কিন্তু ওর মধ্যেই যে মাকে দেখলাম।

[ইতিমধ্যে সেরেস্তার কর্ম্মচারীদের সহিত মথুর প্রবেশ করিলেন। রামকৃষ্ণ বলিলেন]

—কি গো সেজবাবু, ভাল আছ তো ?

মথুর ॥ হ্যাঁ ভাল (প্রণাম)। শুনলাম আপনি কাল এসেছেন— তাই রাণীমা পাঠালেন আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য।

রামকৃষ্ণ ॥ আমি গিয়ে আর কি করবো ? রোগটা তো আর ভাল করে দিতে পারবো না গো ! ও মায়ের অষ্ট নায়িকার এক নায়িকা। এখানকার খেলা ওর ফুরিয়েছে, মা ওকে ডাকছে। আমি গিয়ে কি আর ওকে ধরে রাখতে পারবো ?

মথুর ॥ (হাতের দলিলটি আগাইয়া দিয়া) বিয়ে করে দেশ থেকে ফিরলেন —তাই রাণীমা বউমাকে এই যৌতুকটা দিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ॥ কি ওটা ?

মথুর॥ কিছুই নয়। সামান্য হাজার দশেক টাকার একটা সম্পত্তি আপনার নামে দলিল কোরে দেওয়া হয়েছে।

রামকৃষ্ণ॥ (সরোষে গর্জ্জন করিয়া) কি ! তুই আমাকে বিষয়ী কোরতে চাস শালা ? তোকে আজ মেরেই ফেলবো।

[সহসা একটি বাঁশ কুড়াইয়া লইয়া মথুরকে তাড়া করিলেন। হলধারী ও হৃদয় রামকৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে কয়েকজন চৌকিদার ছুটিয়া আসিল। রামকৃষ্ণ তখনও বলিতেছেন]

রামকৃষ্ণ॥ ছেড়ে দে হৃদে ! দেখে নি ও শালাকে—আমাকে এসেছে যৌতুক দিতে। আমাকে এসেছে কি না বিষয়ে বাঁধতে ?

চৌকিদারগণ॥ কি এতবড় আস্পর্দ্ধা সেজবাবুকে মারতে যায় ?

গণেশ॥ ওই বাঁশ, ওর পিঠে দিয়ে দাও—ঘা কতক।

[ইতিমধ্যে খাজাঞ্চীখানার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আসিল। মথুর তাহাদিগকে তাড়া দিয়া বলেন]

মথুর॥ যাও সব এখান থেকে। কি জন্য এখানে ভীড় করতে এসেছ ?

[বেগতিক বুঝিয়া রামকৃষ্ণ ছুটিয়া মন্দিরের দিকে গেলেন। মথুর, হৃদয় ও হলধারী তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন]

দৃশ্যান্তর

[রামকৃষ্ণ ততক্ষণে শিব মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া একটি শিবকে দু হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছেন ও বলিতে সুরু করিয়াছেন]

রামকৃষ্ণ ॥ মহাদেব গো! মহাদেব, আমায় বাঁচাও—আমি মূর্খ, অজ্ঞান, না বুঝে একটা কাজ করে ফেলেছি—আমায় বাঁচাও। মহাদেব গো মহাদেব!

[ইতিমধ্যে মথুর, হৃদয় ও হলধারী প্রবেশ করেন। মথুব বলেন]

মথুর ॥ (সস্নেহে) কোন ভয় নেই বাবা—আপনি আসুন।

রামকৃষ্ণ ॥ না যাব না, ওরা যদি মারে?

মথুর ॥ কারুর সাধ্য নেই আপনার গায়ে হাত তোলে—আপনি আসুন।

[রামকৃষ্ণ ভয়ে ভয়ে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন)

রামমষ্ণ ॥ কিছু অন্যায় কোরে ফেলেছি কি, সেজবাবু?

মথুর ॥ না না—কিছু অন্যায় করেন নি। বরং বিষয় আসরে আপনাকে বাঁধতে যাওয়া আমাদেরই অন্যায় হয়েছে।

রামকৃষ্ণ ॥ ওদের তুমি একটু বলে দাও সেজবাবু আমায় যেন আর মার ধর না করে।

মথুর ॥ না না, কেউ কিছু বলবে না। কোন ভয় নেই আপনার। আমি সকলকে ডেকে বলে দিয়ে যাচ্ছি।

[মথুর অগ্রসর হইতেই]

রামকৃষ্ণ ॥ তুমি চলে যাচ্ছ নাকি গো সেজবাবু ?

মথুর ॥ হ্যাঁ, বেশীক্ষণ তো থাকবার যো নেই—রাণীমার অসুখ বড্ড বাড়াবাড়ি—

রামকৃষ্ণ ॥ রাণীমাকে বলো আমি যাব।

মথুর ॥ কবে যাবেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ ফাঁক পেলেই পালাব।

মথুর ॥ (সহাস্যে) আচ্ছা, আচ্ছা—

[মথুর চলিয়া গেলেন]

হলধারী ॥ তুই একটা আস্ত হতভাগা, বুঝলি গদা—তুই একটা আস্ত হতভাগা।

রামকৃষ্ণ ॥ কেন ? আমি আবার তোমার কি করলাম ?

হলধারী ॥ হাতে পেয়েও তুই এমন সুযোগ ছেড়ে দিলি। দশ হাজার টাকার জমিদারীর একটা তালুক, যা দিয়ে সংসারের একটা হিল্লে হোয়ে যেত, সেজবাবু কিনা তাই তোকে যেচে দিতে এলেন—আর তুই কিনা বাঁশ নিয়ে তেড়ে তাঁকে মারতে গেলি ?

রামকৃষ্ণ ॥ তা আমি কি করবো—মা যা করালে তাই করলাম।

হলধারী ॥ তোর ঐ নেকামো করে মা মা করাটা ছাড়। বৈষ্ণবের ছেলে—বিষ্ণু ভজনা কর।

রামকৃষ্ণ ॥ বলি কালী আর কৃষ্ণ এরা বুঝি দু ছিস্তে ?

হলধারী ॥ নয়তো কি ? কৃষ্ণ দ্বারকাধিপতি বাঞ্ছাকল্পতরু, আর কালী শ্মশানবাসিনী, তামসী।

রামকৃষ্ণ ॥ (হো হো করে হেসে) বা বা, কি বুদ্ধি গো তোমার হলধারী দাদা। আচ্ছা মাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো।

হলধারী ॥ যা যা করগে জিজ্ঞাসা। হাঁদবড় মুখ্যু কোথাকার ?

পড়াশুনা করলে তবে তো জানবি। আয় হৃদে, ও হতভাগা যা খুশী তাই করুক গে।

[হলধারী ও হৃদয় চলিয়া গেল। রামকৃষ্ণ আপন মনে বলেন]

রামকৃষ্ণ॥ মা! হলধারী দাদা কি বলে। তুই কি শুধু শ্মশান-বাসিনী, তামসী? এলোকেশী মা কি আমার রাক্ষসী সর্ব্বনাশী? মা, মা—

দৃশ্যান্তর

[রামকৃষ্ণ উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতেছেন ও বলিতেছেন]

রামকৃষ্ণ॥ মা তোকে বলতে হবে—বল মা বল, তুই কি? মা মা তুই সত্যিই কি শ্মশানবাসিনী, তামসী—

[রামকৃষ্ণের ব্যাকুলতায় মা সাড়া দিলেন। আকাশ-পথে কালিকামূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। কালিকামূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইলেন সেইস্থলে শ্যাম-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। রামকৃষ্ণ তখন সমাধিস্থ]

সপ্তম দৃশ্য

[কালীঘাট আদি গঙ্গার তীরস্থ রাণী রাসমণির বাড়ী। রোগশয্যায় রাণী রাসমণি। জগদম্বা শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছিল]

রাসমণি॥ পদ্ম বলে জগ, মন্দির করাই আমার নাকি কাল হয়েছে।

জগদম্বা॥ বলুক গে না মা, তোমার কাজ তুমি করেছ। কে কি বলছে, বা বলবে—এ নিয়ে মন খারাপ করছ কেন মা?

রাসমণি ॥ আর তো কিছু নয় মা, পদ্ম যে সই দিল না—

জগদম্বা ॥ না দিক। তার জন্যে ত তোমার উইল আট্‌কে নেই মা?

রাসমণি ॥ তা নেই। গতকাল পাকা উইল হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও ভাবনার শেষ নেই। এখনও ও যদি সই দিতো, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। আমার অবর্ত্তমানে শেষে এই নিয়ে যদি গণ্ডগোল করে? শেষ পর্য্যন্ত মায়ের ভোগরাগ হবে না—পেটের মেয়ে বিঘ্ন ঘটাবে?

[ইতিমধ্যে মথুর আসেন]

এই যে মথুর এসেছ—ছোট ভট্‌চায্যির সঙ্গে দেখা হোল?

মথুর ॥ হ্যাঁ।

রাসমণি ॥ কবে আসবেন, কিছু বললেন?

মথুর ॥ বললেন, সময় মতন আমি নিশ্চয়ই যাব। আপনি তো মা তাঁর ভাবনা ভেবে দলিল-টলিল করলেন, কিন্তু সে দলিল দিতে গিয়ে আমার তো প্রাণ যেতে বসেছিল আর কি!

রাসমণি ॥ সে কি? কি হোয়েছিল?

মথুর ॥ যেই বলেছি, বিয়ের যৌতুক স্বরূপ মা হাজার দশেক টাকার একটা সম্পত্তি আপনার নামে দলিল করে পাঠিয়েছেন—অম্‌নি একটা বাঁশ নিয়ে আমায় তেড়ে এলেন মারতে—বোল্‌লেন, "কি আমায় বিষয়ী করতে চাস্?"

[রাসমণি কথাগুলি শুনিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া]

রাসমণি ॥ আত্মভোলা বৈরাগী! আমরা বিষয়ে বাঁধতে চাইলে উনি তাতে বাঁধা পড়বেন কেন?

মথুর ॥ কিন্তু আশ্চর্য্য! অত যে রাগ এক নিমেষেই তা জল হয়ে গেল! মন্দিরের চৌকিদার, কর্ম্মচারীরা তো তেড়ে মারতে এসেছিল—

বাঁশ ফেলে দিয়ে ভয়ে ভয়ে উনি তখন শিবের মন্দিরে গিয়ে শিবঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে—"মহাদেব গো মহাদেব" বলে সে কি কান্না!

রাসমণি॥ সাধারণ মানুষ ওঁকে বুঝতে পারে না মথুর। পদ্মার মত অনেকেই ওঁকে ভুল বোঝে। তুমি দেখো—কেউ যেন কোনদিন ওঁকে অপমান না করে—ওঁর মনে আঘাত না দেয়—তাহলে দক্ষিণেশ্বরের মাটি আর দাঁড়িয়ে থাকবে না বাবা—সবটাই ঐ গঙ্গাগর্ভে ডুবে যাবে।—হ্যাঁ ভাল কথা, জানবাজার থেকে পদ্ম দেখতে এসেছিল—আজও তো তাকে কত করে বুঝিয়ে বললাম—কিন্তু কিছুতেই সই দিতে রাজী হোল না।

মথুর॥ আমি না হয় আর একবার বলে দেখবো মা—

রাসমণি॥ দেখ কিন্তু ফল কিছু হবে বলে মনে হয় না। যা জগ, অনেক রাত হয়ে গেল। মথুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করগে—

জগদম্বা॥ অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা—এমন কিছু রাত হয় নি। তুমি ঘুমোও, তারপর আমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবো।

রাসমণি॥ না না, তুই যা—অনেকক্ষণ খুঁটি হোয়ে বসে আছিস। আমি এখুনি ঘুমিয়ে পড়বো। তুই যা জগ আর দেরী করিস না।

[মথুর ও জগদম্বা উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

রাসমণি॥ ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যা জগ—নইলে আমার ঘুম আসবে না।

[জগদম্বা সেজটী নিভাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাসমণি কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলেন—ঘুমের ঘোরে বলিতে থাকেন]

....আমার এত সাধের ঠাকুরবাড়ী; শেষে পেটের মেয়ের জন্য কি তা পণ্ড হবে? কেন সই করলো না ও? লক্ষ্মী মা আমার—মায়ের কথা শোন—সই কর, ঠাকুরের সেবার পথে বাধা হোস্‌নে মা!

[রাসমণি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিলেন, পরে ঘুমের ঘোরে আবার বলিলেন]

—কেন সই করলো না পদ্ম ? কেন ? কেন ?

[সেই অন্ধকারের মাঝে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে সহসা রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল]

রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি ॥ নাই বা সই করলো—

[এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া রাসমণির শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন]

রাসমণি ॥ (সোৎসাহে) —বাবা !....বাবা এসেছ !

[রাসমণি উঠিয়া বসিতেছিলেন—রামকৃষ্ণ বাধা দিয়া বলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ উঠো না মা, উঠো না। সই করলো না বলে, এত উতলা হোয়ে পড়লে কেন মা ? তোমার মেয়ে নাই বা সই করলো ? বলি, মা ভবতারিণী কি মামলা করে নিজের ভোগের যোগাড় করবে—না তোমার মেয়ে লড়তে পারবে মায়ের সঙ্গে ?

রাসমণি ॥ তুমি যখন এসেছ, তখন জানি, মা আমার উপোসী থাকবেন না। তোমার ঠাকুর তুমি দেখো।

রামকৃষ্ণ ॥ তা না হয় দেখবো। কিন্তু তুমি ?

রাসমণি ॥ পায়ের ধুলো দাও বাবা, আশীর্ব্বাদ করো এবার যেন যেতে পারি।

রামকৃষ্ণ ॥ তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হোয়ে মা তোমাকে নিয়ে যেতেই আসছেন—তাই তো জিজ্ঞাসা করছিলাম গো—এখন মায়ের সঙ্গে যাবে ? না মেয়েদের ভাবনা ভাববে ?

রাসমণি ॥ না বাবা ! মেয়েদের ভাবনা আর ভাববো না, আমি যাব—আমি যাব, আমি যাব।

[চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সহসা রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। রাসমণি ব্যস্তভাবে ডাকিলেন]

রাসমণি ॥ জগ—মথুর—

[রাসমণির ডাকে ব্যস্তসমস্তভাবে জগদম্বা ও মথুর ছুটিয়া আসেন]

জগ ও মথুর ॥ কি হোল মা—কি হোল ?

রাসমণি ॥ ঠাকুর এসেছিলেন—ঠাকুর !

জগ ॥ ঠাকুর ! কই ? কোথায় তিনি ?

রাসমণি ॥ হওয়ায় ভেসে এসেছিলেন—আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন !

মথুর ॥ সে কি !

রাসমণি ॥ হ্যাঁ বাবা ! বোললেন, মেয়েদের ভাবনা ভাববি ? না মা নিতে আসছেন তাঁর সঙ্গে যাবি ? ঠাকুরকে বলেছি মথুর, আমি মার সঙ্গে যাব ? জান মথুর ঠাকুর বলেছেন কোন ভয় নেই—মায়ের সঙ্গে লড়াই করে মেয়ে পারবে না। তোমরা আমায় গঙ্গার ঘাটে নিয়ে চল বাবা আর দেরী কর না।

জগ ॥ মা—মা কি বলছো ?

রাসমণি ॥ হ্যাঁরে ঠিকই বলছি, দেখতে পাচ্ছিস না ? মা যে আমায় নিতে আসছেন। আমি কি আর এমন করে এখানে পড়ে থাকতে পারি রে ? তোরা আমায় গঙ্গার ঘাটে নিয়ে চল্। ওরে দেখতে পাচ্ছিস না ? সমস্ত আঁধার ঘুচিয়ে মা আসছেন আলো কোরে—তোরা আলো নেভা—তোরা আলো নেভা—

[জগদম্বা ব্যাকুলভাবে রাসমণির বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

জগ ॥ মা ! মা ! মাগো !

[ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসে]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ। অদূরে গঙ্গা। একটি রামমূর্ত্তির সম্মুখে যোগেশ্বরী ভৈরবী রামনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এই গানের মাঝে রামকৃষ্ণ আসেন এবং দূর হইতে যোগেশ্বরীকে দেখেন]

ভক্তি পরায়ণ মুক্তিদ রাম।
সর্ব্ব চরাচর পালক রাম॥
সর্ব্ব ভবাময় বারক রাম।
বৈকুণ্ঠালয় সংস্থিত রাম॥
নিত্যানন্দ পদস্থিত রাম।
রাম রাম জয় রাজা রাম॥
রাম রাম জয় সীতা রাম॥

[গান শেষ হইলে যোগেশ্বরী রামকৃষ্ণের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন। পরে বলেন]

ভৈরবী॥ আমি তোমাকে কতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

রামকৃষ্ণ॥ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছ? কেন মা?

ভৈরবী॥ ছেলেকে মা খুঁজে বেড়াবে না তো কে খুঁজে বেড়াবে? শোন বাবা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

[রামকৃষ্ণ ও ভৈরবী বসিলেন]

দেখ বাবা, জপে বসে দেখলাম, তুমি এখানে রয়েছ। শুনলাম, তুমি বলেছো—শাস্ত্রের নির্দেশ দিয়ে কে তোমাকে সাধনার পথ বলে দেবে—তাই তোমার কাছে এলাম।

রামকৃষ্ণ ॥ বেশ করেছ মা, বেশ করেছ।

ভৈরবী ॥ আমি তোমাকে ধাপে ধাপে চলতে শেখাব গুরুর মতন—কেমন ?

রামকৃষ্ণ ॥ (সোৎসাহে) বেশ তো মা ! তুমি কে মা ? কোথায় থাক ? কাদের মেয়ে ?

ভৈরবী ॥ আমি ভৈরবী, বাউনের মেয়ে, কুমারী, ব্রহ্মচারিণী—

রামকৃষ্ণ ॥ থাক্ থাক্ আর পরিচয় দিতে হবে না। গেরুয়া পরা মায়ের অতীত কালের পরিচয় জানতে নেই।

ভৈরবী ॥ আমার এখনকার গুরুদত্ত নাম—যোগেশ্বরী।

রামকৃষ্ণ ॥ বাঃ বাঃ ! বেশ নাম। যোগমায়ার মেয়ে, যোগেশ্বরী !

[রামকৃষ্ণ রঘুবীরের মূর্ত্তির দিকে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ ও কি !

ভৈরবী ॥ আমার ইষ্ট !

রামকৃষ্ণ ॥ একি ! এ যে রঘুবীরের মূর্ত্তি !

ভৈরবী ॥ হ্যাঁ, এই আমার ইষ্ট ! কত কাল ধরে এই ইষ্ট মূর্ত্তির পূজা করছি, ভোগ নিবেদন করছি—আজ সে ইষ্টকে আমি প্রত্যক্ষ কোরলাম। দরকার কি আর এ মূর্ত্তি বয়ে নিয়ে বেড়াবার ?

[ভৈরবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও গঙ্গাগর্ভে ইষ্টমূর্ত্তি নিক্ষেপ করিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ (ব্যাকুলভাবে) ও কি করলে মা ! ও কি করলে ! মূর্ত্তি গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার গা যে জলে গেল—থেকে থেকে এমন গা জলে, তোমায় কি বলবো।

ভৈরবী ॥ তোমার গায়ের জ্বালা আমি সারিয়ে দেবো। ও জ্বালা তো জলে জুড়োবার নয়।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে ?

ভৈরবী ॥ ও যে মনের জ্বালা, মহাভাবের জ্বালা—অমন জ্বালায় শ্রীমতী জ্বলে ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে। গোবিন্দ দর্শণের আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে ছিলেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু! আর সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে জ্বলে ছিলেন—শিবশম্ভু! এইসব কাহিনী পুঁথিতে লেখা আছে। তোমায় আমি পড়ে পড়ে শোনাব।

রামকৃষ্ণ ॥ এ জ্বালা কি করে সারে পুঁথিতে লেখা আছে ?

ভৈরবী ॥ আছে বৈ কি—পুঁথিতে কি লেখা নেই বাবা—সব আছে।

রামকৃষ্ণ ॥ গায়ের জ্বালায় জ্বলে মরি, সবাই পাগল পাগল বলে—দাও না আমার জ্বালাটা সারিয়ে।

ভৈরবী ॥ দেবো। এখন একটু থাকবার যায়গা দেখিয়ে দাও দিকিনি।

রামকৃষ্ণ ॥ বেশ তো থাক না—মন্দিরে ত কত জায়গা পড়ে রয়েছে।

ভৈরবী ॥ মন্দিরে মানুষের ভীড়েতে থাকতে পারব না।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে কোথায় থাকবে ?

ভৈরবী ॥ কেন ? তোমার ঐ পঞ্চবটীতে আপত্তি আছে ?

রামকৃষ্ণ ॥ না-না—আপত্তি কি ? তবে ঐ খোলা যায়গায় কি তুমি থাকতে পারবে ?

ভৈরবী ॥ খুব পারবো। ঐ তো সাধনার উপযুক্ত স্থান।

[সহসা হৃদয়, হলধারী ও মন্দিরের অপরাপর কর্ম্মচারীসহ মথুর প্রবেশ করেন]

রামকৃষ্ণ ॥ এই যে! এস সেজবাবু। দেখ, রাণী মা-ও গেল আর সঙ্গে সঙ্গে এই ভৈরবী মা-ও এসে হাজির হলো। তাইতো ভাবছি গো! রাণীমা গিয়ে কি ভৈরবী মা-কে পাঠিয়ে দিল নাকি ? (হাসিলেন) ও হৃদু, ভৈরবী মা বলে কি জানিস ? আমার গায়ের জ্বালা সারিয়ে দেবে—

মথুর ॥ তাই নাকি? আপনি বাবার গায়ের জ্বালা সারিয়ে দেবেন?

ভৈরবী ॥ দেব বৈ কি—নিশ্চয়ই সারিয়ে দেব।

হৃদয় ॥ ও জ্বালা কমে কিসে?

ভৈরবী ॥ ফুল আর চন্দনে।

মথুর ॥ বেশ তো—রাশি রাশি ফুল দেব, বাটী বাটী চন্দন দেবো। বাবার গায়ের জ্বালা নিবারণ করুন মা!

হলধারী ॥ ও কথা শোনেন কেন সেজবাবু? ফুল চন্দনে যদি গায়ের জ্বালা যেত তাহলে আর ভাবনা ছিল না। উন্মাদ রোগে গায়ের অমন জ্বলুনি পুড়নি হয়।

ভৈরবী ॥ (হুঙ্কার দিয়ে) কে বলে উন্মাদ, রামকৃষ্ণ উন্মাদ নয়—

হলধারী ॥ কি তবে?

ভৈরবী ॥ অবতার!

হলধারী ॥ নাঃ! পাঁচজনে মিলে ক্ষেপিয়ে ভাইটাকে আমার পাগল না করে ছাড়বে না সেজবাবু। অবতার অমনি বললেই হোল? আমরা শাস্ত্র কি কিছুই পড়ি নি নাকি? শাস্ত্রে তো দশটার বেশী অবতারের রূপ লেখা নেই। বাকী আছেন তো শুধু কল্কি—

মথুর ॥ আমরাও তো তাই জানি।

ভৈরবী ॥ কে বলে দশটি? শ্রীমৎ ভাগবতে বাইশটি অবতারের রূপ লেখা আছে। এ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, "সম্ভবামী যুগে যুগে"। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, ডাকুন, বৈষ্ণব-পণ্ডিতদের—ডাকুন, শাক্ত-শৈবদের, সভা বসান। আমি প্রমাণ করে দেব যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার! শ্রীরামকৃষ্ণ রঘুবীর! শ্রীরামকৃষ্ণ আমার ইষ্ট!

[কথার সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী সমাধিস্থ হইলেন। রামকৃষ্ণ ব্যাকুলভাবে প্রণাম করিয়া বলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ মা—মাগো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তখন সন্ধ্যা। দক্ষিণেশ্বরের বাঁধা ঘাট। সম্মুখে ভাগিরথী বহিয়া চলিয়াছে। মন্দির হইতে শানাই-এর সুর ভাসিয়া আসিতেছে। জনৈক সাধুর ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। সাধু গঙ্গা হইতে সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতেছিলেন ও 'রামনাম' গান করিতেছিলেন]

বর্হাপীড়াভি রামং
মৃগামদ তিলকং
কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং
স্মিত সুভগমুখম্
স্বাধরে ন্যস্ত বেণুম্
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গম্
রবিকর বসনং ভূষিতাং বৈজয়ন্তা
বন্দে লোকাভিরামং যুবতী শতবৃতম্
ব্রহ্ম গোপালবেশম্।

[সাধুর অস্পষ্ট মূর্ত্তি অন্তর্হিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে একটি কিশোর ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। তাহার মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা। পায়ে নূপুর, হাতে বালা, পরণে বৃন্দাবনী কাপড়। কিশোর-মূর্ত্তি তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি দিয়া গঙ্গার দিকে নামিতেছিল। দেখিয়া মনে হয়, সে যেন কাহার সহিত লুকোচুরি খেলিতেছে। সহসা থমকাইয়া

দাঁড়াইয়া ফিক্ করিয়া হাসিল। পুনরায় সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়ামূর্তি প্রকাশ পাইল। তিনি ব্যাকুলভাবে বলিতেছিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে যাস্‌নে—যাস্‌নে—এই ভর সন্ধ্যেবেলা জলে নামলে, সর্দ্দি হবে যে! নাঃ! নাঃ! আর পারিনে—কি দামাল ছেলেরে বাবা!

[শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়ামূর্তি জলের দিকে নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ঘুরিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর। শিবমন্দির সংলগ্ন একটি চাতাল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হৃদয় রামকৃষ্ণের ব্যাপার দূর হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে হলধারী প্রবেশ করেন]

হলধারী ॥ গদাই কোথায় রে হৃদে?

হৃদয় ॥ কোথায় তা কি কোরে জানবো?

হলধারী ॥ এদিকে আবার কি কাণ্ড করে বসেছে, শুনেছিস্?

হৃদয় ॥ কি?

হলধারী ॥ শুন্‌ছি, নাগা সাধুটার কাছে আবার নাকি কি সাধন-ভজন শিখবে।

হৃদয় ॥ হ্যাঁ, আমিও শুনেছি, মামা বলছিল বটে—

হলধারী ॥ কি বলছিল?

হৃদয় ॥ বল্‌ছিল, হৃদু দু' চারদিন আমি ঘরে নাও ফিরতে পারি। আমার জন্যে ভাবিস্ নি। শুনলাম, দিদিমাকেও নাকি ঐ কথাই বলেছে—

হলধারী ॥ এখন মগজে যেটুকু আছে, সাধু সন্ন্যাসীদের পাল্লায় পড়ে সেটুকুও আর থাকবে না। ঐ ভৈরবী বেটী তো কি সাধন-ভজন শেখাল জানিনে—কতদিন হয়ে গেল, এইখানে সে আসন গেড়ে বসেছে—নড়বার নামটি নেই। তারপরে এল আর এক সাধু—দিয়ে গেল ছোট্ট একটা রামমূর্তি—তার আবার আদর করে নাম রাখল "রামলালা"। সেই রামলালাকে নিয়ে তো আদিখ্যেতার শেষ নেই। তার ওপর আবার এই —নাগা সন্ন্যাসী। নাঃ! একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখ্‌ছি।

হৃদয় ॥ তা তোমার অত মাথা ব্যথা কেন? মামা যা ভাল বুঝছে—করছে। তার ভাই রয়েছে, মা কাছে এসে রয়েছেন—বারণ করতে হয়, বাধা দিতে হয়, তাঁরা দেবেন।

হলধারী ॥ মা কাছে এসে থাকলে কি হবে? শোকে তাপে তাঁর মাথায় কি আর কিছু আছে? বিয়ে-থাওয়া করেছে—আমরা আত্মীয়-স্বজন কাছে থাকতে বলব না? একশোবার বলব—

[হলধারী বিরক্তভাবে চলিয়া গেল। হৃদয় সবিস্ময়ে সেদিকে চাহিয়া রহিল। ইতিমধ্যে নাগা সন্ন্যাসী তোতাপুরী প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিল]

তোতাপুরী ॥ বেটা, উস্ তর্‌হা উও গ্যায়া কাঁহা?

হৃদয় ॥ (বিরক্ত হইয়া) জানি না।

তোতাপুরী ॥ জান্‌তা হ্যায়, বোল্‌তা নেহি। রামলালাকো পাকড়্‌কে গ্যায়া।

হৃদয় ॥ (তোতাপুরীর সম্মুখে বিরক্তভাবে হাত-মুখ নাড়িয়া) সব জান্‌তা, ন্যাকা সাজ্‌তা—সাধু সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে প্রাণটা আমার গেল!

তোতাপুরী ॥ প্রাণ আব নহি যায়গা। দেখ্‌না আব সব ঠাণ্ডা হো যায়গা।

হৃদয় ॥ সে তোমরা থাকতে আর নয়। একে মা মনসা, তার ওপর আবার ধুনোর গন্ধ।

[হৃদয় চলিয়া গেল। রামকৃষ্ণ প্রবেশ করেন, তাঁহাকে দেখিয়া তোতাপুরী বলেন]

তোতাপুরী ॥ কেঁও পাক্‌ড়া রামলাল্‌কো ?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, খাবার দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে রেখে এসেছি।

তোতাপুরী ॥ আচ্ছি বাত্ হ্যায়। আব গঙ্গাস্নান কর্ পঞ্চবটীমে যা—হোম্‌কা আয়োজন কর্—হাম্ আতে হ্যাঁয়।

[তোতাপুরী প্রস্থানোদ্যত]

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ—একটা কথা, মাকে আমি বলেছি, গেরুয়া পরবো না—পরতে পারবো না।

তোতাপুরী ॥ ঠিক হ্যায়। পর্ শিখা-সূত্র তুঝে ছোড়না হোগা।

রামকৃষ্ণ ॥ ছাড়বো।

তোতাপুরী ॥ ইয়াদ রাখনা হোগা, বেদান্ত সাধ্‌নামে সর্ব্ব তেয়াগ্ করনা পড়্‌তা হ্যায়।

রামকৃষ্ণ ॥ কেন ?

তোতাপুরী ॥ আভি তেরী যো অভস্থা হ্যায় ভউইষ্‌মে উও নহি রহেগি।

রামকৃষ্ণ ॥ তা হলে বৈদিক সাধনায় আমার কাজ নেই—

তোতাপুরী ॥ দেখতাহুঁ মোহাচ্ছন্ন হ্যায় তু। ইয়াদ্ রাখ্‌না—সব মায়া, সব ঝুঠা হ্যায়।

রামকৃষ্ণ ॥ হয় তো তাই—তবুও আমি এ সাধনা করতে পারব না।

তোতাপুরী ॥ কেঁও বেটা ?

রামকৃষ্ণ ॥ আমার মা আছেন। মা আমার মায়াও নন, মিথ্যাও নন, তিনি আছেন আর চিরকাল থাকবেনও।

তোতাপুরী ॥ সমঝ্ গ্যায়া। উস্ মন্দিরকী মাকী বাত্ কয়তো হ্যায়।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ। ওখানে আছেন জগন্মাতা। আর ঐ নহবৎ ঘরে আমার কাছে এসে আছেন, আমার গর্ভধারিণী জননী! আমি সন্ন্যাসী না সেজে, সন্ন্যাস নিতে চাই—হবে না?

তোতাপুরী ॥ আচ্ছা বেটা, ওয়েসাহি হোগা। মন্মে যিসকা রং লাগা, উসে গেরুয়া পাহান কর সন্নাসী বন্‌নেকা কোই কাম নেহি।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ—আর একটা কথা—আমি বিবাহিত।—স্ত্রীকে কিন্তু কোনদিনই ত্যাগ করতে পারবো না।

তোতাপুরী ॥ স্ত্রীকা তেয়াগ্ তুঝে নেহি করনা হোগা। তেরী নিষ্ঠা, তেরা আত্মসংযম তুঝে সাধ্‌নাকে পথ পরলে যায়গা বেটা। যা—পঞ্চবটীমে যা—নিশ্চিন্ত হো কর, হোম্‌কা আয়োজন কর্, হাম আতে হ্যাঁয়।

[তোতাপুরীর প্রস্থান। রামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর দিকে যাইতে যাইবেন এমন সময় হৃদয় আসিয়া বলে]

হৃদয় ॥ আড়াল থেকে সবই ত শুনলাম, এত সাধন-ভজন করেও তোমার আশ মিটছে না—

রামকৃষ্ণ ॥ সাধনার কি শেষ আছে রে হৃদু—যত মত, তত পথ—

হৃদয় ॥ তা হোক—আর ওসব হাঙ্গামার মধ্যে যেও না। সেজবাবুর শরীর ভাল যাচ্ছে না। তিনি এখন আর রোজ মন্দিরে আসেন না—এই সব দেখে, মন্দিরের কর্ম্মচারীরা আবার যদি গণ্ডগোল বাধায়—

রামকৃষ্ণ ॥ না না। এর সঙ্গে মন্দিরের সম্পর্ক কি?

হৃদয় ॥ কারুর কোন কথাই ত কানে নেবে না। বেশ, যা ভাল বোঝ কর।

[একদিকে রামকৃষ্ণ অপরদিকে হৃদয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর। মন্দির সংলগ্ন কাছারী ঘর। তখন অপরাহ্ন। শঙ্কর গোঁসাইয়ের সহিত অন্যান্য কর্ম্মচারীদের আলোচনা করিতে শোনা যায়]

শঙ্কর ॥ শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা—যে সে কথা নয়, বুঝলে হে—শক্তি-সাধনা করতে গিয়ে, কত তাগ্‌ড়া তাগ্‌ড়া জোয়ান মানুষকে ডিগ্‌বাজি খেতে দেখলাম।

ঘনশ্যাম ॥ তা তুমি যাই বল গোঁসাই, ছোট ভট্‌চায্যির কিছু ক্ষমতা জন্মেছে।

শঙ্কর ॥ আরে ক্ষমতা না ছাই। অমন তুক্ তাক্ করার ক্ষমতা অনেকেরই আছে।

ঘনশ্যাম ॥ বলছো কি গোঁসাই? কেশব সেন থেকে আরম্ভ করে কলকাতার কত লেখাপড়া-জানা লোক যে ছোট ভট্‌চায্যির কাছে ছুটে ছুটে আসছে—সে কি অম্‌নি? তুক্‌তাকে আর দেশের মাথাওয়ালা মানুষদের ভোলাতে হয় না।

শঙ্কর ॥ তুক্‌তাকে মানুষকে ভেড়া করে দেওয়া যায়। বুঝলে, আমাদের গাঁয়ে তুক্-জানা এক লোক ছিল—সে ঘুমন্ত মানুষকে মন্তরের জোরে বিছানা থেকে টেনে আনতে পার্‌তো। ঐ ভৈরবীর কাছ থেকে, ছোট ভট্‌চায তুক্-তাক্, ঝাঁড়-ফুঁক, মন্তর-তন্তর কিছু আদায় করে নিয়েছে। ওসব বুজরুকী ধোপে বেশী দিন টিঁকবে না।

গজানন ॥ আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে টেঁকে কি না? অতবড় একজন সাধু তোতাপুরী যাঁকে পরমহংস নাম দিয়ে গেলেন—তুমি অম্‌নি তাকে তুক্-তাক ঝাড়-ফুঁক বল্লেই হোল?

শঙ্কর ॥ ও! কি উপাধিই না দিয়ে গেছে—আরে বাপু, আচার্য্য, মোহন্ত এসব দিলেও না হয় বুঝতাম।

গজানন ॥ বলি, পরমহংস উপাধিটা কি আচার্য্য, মোহান্তর চেয়ে কিছু কম নাকি? পরমহংস মানে কি জান?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও আমার জানা আছে।

গজানন ॥ বেশ ত বল না? পরমহংস মানে কি?

শঙ্কর ॥ আরে বাপু হংস মানে, পাতি হাঁস আর পরমহংস হচ্ছে—রাজহাঁস!

গজানন ॥ তোমার মুণ্ডু! দুধে জলে এক হয়ে থাকলে যিনি জলটুকু ফেলে কেবল দুধটুকু বার করে নিতে পারেন, বালি আর চিনির মধ্য থেকে যিনি চিনিটুকু বেছে নিতে পারেন, তাঁকেই বলে—পরমহংস। অনেক দেখে, অনেক জেনে, তবে সেজবাবুর মত লোক ওঁকে ভগবান বলে স্বীকার করেছেন, আর উনি কিনা—

শঙ্কর ॥ স্বীকার করার ফলও তো হাতে হাতেই দেখতে পাচ্ছো—বিছানায় পড়েছেন—

গজানন ॥ দেখ গোসাই, তোমার কথাবার্ত্তাগুলো আজকাল বড় লম্বা লম্বা শোনাচ্ছে—

শঙ্কর ॥ শোনবেই তো! হাজার হোক, আমি গোস্বামী সন্তান—এ যাবৎ মানুষের মাথায় পা দিয়েই চলে এসেছি—দেশের আবহাওয়া বুঝে, সেই পা না হয় এখন গুটিয়েই নিয়েছি। তা বলে দুটো কথাও যদি একটু লম্বা কোরে না বলি, তা হলে গোস্বামী কুলে জন্মানই যে আমার বৃথা!

গজানন ॥ দেখ গোসাই পা গুটিয়েছ ভয়ে। আবার তেমন পাল্লায় পড়লে মুখটিও বন্ধ করতে হবে, মনে রেখো।

শঙ্কর ॥ আচ্ছা আচ্ছা—সে দেখা যাবে।

[ইতিমধ্যে হৃদয় ব্যস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করে]

ঘনশ্যাম ॥ ব্যাপার কি মুখুয্যে, হন্ত দন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলে যে?

হৃদয় ॥ সর্ব্বনাশ হয়েছে! জানবাজার থেকে এইমাত্র খবর এলো, সেজবাবু মারা গেছেন!

ঘনশ্যাম ॥ এ্যাঁ! সে কি!

হৃদয় ॥ মামা আজ কদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেজবাবু আর এ যাত্রায় বাঁচবেন না।

শঙ্কর ॥ বুঝতে পারবেন বৈ কি! হাজার হোক, তোমার মামা সর্ব্বজ্ঞ যে—

হৃদয় ॥ সত্যিই সর্ব্বজ্ঞ। রাণীমা যাবার আগেও ঠিক ঐ রকম বলেছিলেন। আজকাল মামার কথাবার্ত্তা শুনলে তাক্ লেগে যায়!

শঙ্কর ॥ লাগবেই তো—হাজার হোক, ওটা তুকের পরেই যে—কি গো! বলি নি? তুক্‌তাক্—হেঁ হেঁ বাবা! হাজার হোক, আমি গোস্বামী সন্তান।

হৃদয় ॥ (রাগে, দুঃখে ও ক্ষোভে) কি বলবো গোসাই! সেজবাবুর মৃত্যুর খবরে বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করছে। নইলে তুক্-তাকের পরখটা আমি তোমার ওপরেই চালাতাম। ওর জন্যে আর মামাকে দরকার হোত না!

[হৃদয় বেগে প্রস্থান করে। গজানন ও ঘনশ্যাম দুঃখিত মনে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া থাকে। শঙ্কর হৃদয়ের গমনপথের দিকে চাহিয়া থাকে]

পঞ্চম দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর। রামকৃষ্ণের ঘর-সংলগ্ন বারান্দা। রাম দত্ত, নরেন্দ্রনাথ, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া আছেন। নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে একটি তানপুরা পড়িয়া আছে]

রাম দত্ত ॥ হ্যাঁ হে নরেন, সেদিন ষ্টার থিয়েটারে 'চৈতন্য-লীলা' কেমন দেখ্‌লে ?

নরেন ॥ চমৎকার! অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নাটকে ভক্তির ভাবটি ফুটেছে।

রাম দত্ত ॥ শুনেছি বটে। গিরিশ ঘোষ মদই খাক আর যাই করুক—লোকটার লেখার কিন্তু সকলেই প্রশংসা করে।

নরেন ॥ সত্যি, প্রশংসা করবার মতনই লেখা। ব্যক্তিগত চরিত্রে তার যত দোষই থাকুক না কেন—লোকটার পড়াশুনা এবং পাণ্ডিত্য আছে।

ভবনাথ ॥ দেবেনের কাছে শুনছিলাম, অভিনয় দেখে ঠাকুর নাকি তন্ময় হোয়ে গিয়েছিলেন ?

নরেন ॥ শুধু তন্ময় নয় সেনমশায়, বরং বলা চলে, ভাবসমাধিস্থ হয়েছিলেন।

ভবনাথ ॥ বলো কি!

নরেন ॥ হ্যাঁ—ঠাকুর 'চৈতন্য-লীলা'র অভিনয় দেখতে দেখতে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করতে লাগলেন।

[ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ কিরে নরেন—তোরা কতক্ষণ ?

নরেন ॥ এই কিছুক্ষণ হোল। সেদিন 'চৈতন্য-লীলা' অভিনয় দেখার কথা হচ্ছিল।

রামকৃষ্ণ ॥ সত্যি। বুঝলি রাম, লোকটা বড় ভাল লিখেছে রে, ভাল লিখেছে। ওর ভেতরে বস্তু আছে—ভক্তিরসে একেবারে মজিয়েছে। ও মদই খাক আর যাই করুক নরেন—নিজে না মজলে অপরকে এমন করে মজাতে পারে না।—গান গাইছিলি নাকি রে ?

নরেন ॥ না, এই গাইব গাইব মনে করছিলাম।

রামকৃষ্ণ ॥ তা গা না—গা—

[নরেন গান ধরিল]

চিদাকাশে হলে পূর্ণ
প্রেম চন্দ্রোদয় হে !
উছলিল প্রেম সিন্ধু
কি আনন্দময় হে !
চারিদিকে ঝল-মল, করে ভক্ত গ্রহদল
ভক্ত সঙ্গে ভক্ত-সখা লীলা রসময় হে।

[নরেন্দ্রনাথ গান শেষ করিয়াই দেখেন, গিরিশ-চন্দ্র দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। নরেনের চোখো-চোখি হইতেই গিরিশ বলেন]

গিরিশ ॥ আসতে পারি নরেন্দ্রবাবু—

নরেন ॥ আসুন—আসুন—

রামকৃষ্ণ ॥ কে ?

নরেন ॥ গিরিশবাবু—

রামকৃষ্ণ ॥ গিরিশ এসেছিস্—আয়—আয়—বোস।

নরেন ॥ আমাকে আবার বাবু কেন? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ আমায় নরেন বলেই ডাকবেন—

রামকৃষ্ণ ॥ বাঃ! বাঃ! বাঃ! বেশ বলেছিস্ নরেন, বেশ বলেছিস। আয় গিরিশ আয়—তোর কথাই এতক্ষণ বলছিলাম, মাইরি—তুই এদের জিজ্ঞাসা কর।

গিরিশ ॥ আমার সৌভাগ্য যে আমাকে মনে রেখেছেন।

রামকৃষ্ণ ॥ রাখবো বৈ কি! তোকে কি ভুলতে পারি? তুই যে আমায় মজিয়েছিস—

গিরিশ ॥ আপনি তবু দয়া করে পায়ের ধুলো দিলেন—শেষ পর্য্যন্ত বসে অভিনয় দেখলেন—শিল্পীদের আশীর্ব্বাদ করলেন—কিন্তু এমনই অপাংক্তেয় আমরা যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কিছুতেই থিয়েটারে আনতে পারলাম না।

রামকৃষ্ণ ॥ আনবি কি কোরে? সাগরকে কি আর বাড়ীর দরজায় আনা যায়? তা বাপু, তোর ঐ 'চৈতন্য-লীলা' আমি আর একদিন দেখব কিন্তু।

গিরিশ ॥ তা বেশ তো।

রামকৃষ্ণ ॥ এবার কিন্তু তোকে টিকেটের দাম নিতে হবে।

গিরিশ ॥ কেন? পাসে দেখলে ক্ষতি কি?

রামকৃষ্ণ ॥ না—না, পাসে এবার আমি দেখবো না। রোজ রোজ পাসে দেখ্‌লে চক্ষু লজ্জার মাথা খাওয়া হয়।

গিরিশ ॥ তাই যদি মনে করেন, তাহলে দেবেন আট আনা।

রামকৃষ্ণ ॥ আট আনার টিকিট—সে যায়গা ভাল নয়, আমি ষোল আনা দিয়েই টিকেট কিনবো—

গিরিশ ॥ বেশ। তাই কিনবেন।

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ্, তোর 'চৈতন্য-লীলা'র ঐ গানটা আমার বড্ড ভাল লেগেছে—"প্রাণভরে আয় হরিবোলে"। এই গানের মধ্যে কিন্তু তোর

বিশ্বাস লুকিয়ে আছে—এই বিশ্বাস যদি রাখতে পারিস্ তা হোলেই হবে।

গিরিশ॥ কি জানি কি হবে। কিন্তু থিয়েটার ছাড়া কারুর কাছে যেতেও সাহস হয় না—বসতেও সাহস হয় না।

রামকৃষ্ণ॥ কেনে গো—লোকের কাছে যেতে বসতে ভয় কি?

গিরিশ॥ ভয় "নটো" বলে—লোকে দেখ্‌লে নাক সিঁটকোয় বোলে। সেদিন আপনি দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্যে যেমন কোরে বোলেছিলেন এমন কোরে এর আগে কেউ আমাকে কোনদিন কারুর কাছে যাবার জন্যে বলে নি। আপনার আদেশে—লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ সব ত্যাগ করে চলে এলাম। তা আপনি যে সেদিন বললেন, আমার মনে বাঁক আছে—সে বাঁক যাবে তো?

রামকৃষ্ণ॥ হঁ্যা হঁ্যা, যাবে বৈ কি! বাঁকার চেয়ে সোজা পথেই এখন চল্‌তে পারবি।

গিরিশ॥ কোন্‌টা সোজা আর কোন্‌টা বাঁকা এই তো বোঝা শক্ত!

রামকৃষ্ণ॥ দেখ্ সৎ চিন্তা, সৎ কথা, সদাচার এর দ্বারাই সৎপথ অবলম্বন করা যেতে পারে।

গিরিশ॥ ও তো উপদেশের কথা। ও উপদেশ আমি অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি। দেখেছি, ওতে কিছু হয় না। আপনি আমার জন্যে কি করতে পারেন বলুন।

রামকৃষ্ণ॥ আমি আর কি করবো, তুই তো বেশ ভাল কাজই করছিস্।

গিরিশ॥ কি আর এমন ভাল কাজ?

রামকৃষ্ণ॥ কেন? এমন খাসা লিখছিস্—

গিরিশ ॥ লিখ্‌ছি—এ লিখেই যাচ্ছি—কিন্তু ধারণা কৈ ?

রামকৃষ্ণ ॥ না, না—তোর ধারণা আছে বৈ কি। ভেতরে ভক্তি না থাকলে কি আর চালচিত্তির আঁকা যায় ?

গিরিশ ॥ কিন্তু চালচিত্তির এঁকে থিয়েটার করা আর ভাল লাগে না।

রামকৃষ্ণ ॥ না না—থিয়েটারের কাজ এ খুব ভাল কাজ। এতে লোকশিক্ষা হয়। তা যাক্—এর পর কি পালা খুলবি ?

গিরিশ ॥ প্রহ্লাদ চরিত্র।

রামকৃষ্ণ ॥ বাঃ! খুব ভাল বিষয়। দেখ্, জমি ভালভাবে পাট করা হোলে, যা রুইবি তাই ফল্‌বে। তবে কি জানিস্—কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

গিরিশ ॥ আশীর্ব্বাদ করুন, সেই কর্ম্মশক্তিই যেন আমি ফিরে পাই।

রামকৃষ্ণ ॥ পাবি রে পাবি। সেই আশীর্ব্বাদই আমি তোকে করছি।

[দেখা গেল শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর। রামকৃষ্ণের ঘর। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। সারদা রামকৃষ্ণের বিছানাটি ঝাড়িয়া রাখিতেছিলেন। এমন সময় রামকৃষ্ণ ঘরে প্রবেশ করেন—সারদা তাহা টের পান নাই—আপন মনে ঘরের কাজ করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণ অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বলেন—]

রামকৃষ্ণ॥ এতদিন পরে তুমি কি আমাকে সংসারের পথে টেনে নিয়ে যেতে এসেছ নাকি গা?

[সারদা সলজ্জে হাসিয়া কাজে মনোনিবেশ করিলেন]

কি গো! ঘর-সংসারী না করে ছাড়বেনা না কি?

[সারদা পুনরায় মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন]

সারদা॥ (সলজ্জে ঘাড় নাড়িয়া জানান) —'না'—

রামকৃষ্ণ॥ বলি ঘাড় তো নাড়ছো, কিন্তু কাজ করছো তো ঘর-সংসারীরই মতন—তুমি আমি এক ঘরে, এক সঙ্গে—

সারদা॥ তাতে কি?

রামকৃষ্ণ॥ ওমা! বলে কি গো! তাতে কী নয়। তাই তো ভাবছি—

সারদা॥ আমি তোমার স্ত্রী। সহধর্ম্মিণী। তাই আমি তোমাকে ইষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছি—

রামকৃষ্ণ॥ বাঃ বাঃ! বেশ বলেছো—তোমার কাছে এইরকম উত্তরই আমি আশা করেছিলাম। কি জান, স্বামী-স্ত্রী দুজনার ভাব, এমন কি স্বভাব এক না হোলে ধর্ম্ম হয় না।

সারদা॥ শুধু ভাব আর স্বভাব নয়, মনেও তো এক হওয়া চাই।

রামকৃষ্ণ ॥ ঠিক বলছো, মনেও এক হওয়া চাই—মনই গুরু আবার মনই বিঘ্ন।

সারদা ॥ কিন্তু মন যদি বিঘ্ন ঘটায় তা হোলে কি হবে?

রামকৃষ্ণ ॥ তারও উপায় আছে। জপ করবে। দেখবে, জপ করতে করতেই জপে মন বসবে। জপে যখন মন স্থির হবে—তখন দেখবে, জপের মন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করেছে। শোন, আজ থেকে তুমি মার কাছে নহবৎ ঘরেই থেক, কেমন?

সারদা ॥ কেন? আমি কি তোমার সাধন-ভজনের পথে বিঘ্ন?

রামকৃষ্ণ ॥ না না—বিঘ্ন তুমি নও। তবে কি জান, রাত্তির বেলা জপে বসে আমি কি রকম হোয়ে যাই, আর তুমি রাত জেগে বসে থাক। এই রকম রাত জেগে কতদিন কাটবে? তাই বলছিলাম, আজ থেকে তুমি মার কাছে থেকো।

সারদা ॥ বেশ। কিন্তু কি নাম জপ করবো বললে না তো?

রামকৃষ্ণ ॥ যে নামে তোমার রুচি হয়। আমি "মা" বলে ডাকি। একাক্ষরা মহামন্ত্র "মা" নাম জপ করি। ইচ্ছে করলে "বাবা" বলেও ডাকতে পার। তবে কি জান, মাকে পাওয়াও সোজা, ডাকাও সোজা। বাপ একটু রাশভারী তো—তাই তার নজরটাও উঁচু হুকুমটাও কড়া। কিন্তু মার ওসব বালাই নেই—ছেলে কাঁদলেই ছুটে আসে, ডাকলেই সাড়া দেয়। ঐ গঙ্গাজলের ঘটিটা নিয়ে এস তো—

[সারদা ঘটি লইয়া আসিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ বসো—মাথায় একটু গঙ্গাজল দাও—

[সারদা বসিলেন পরে রামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে বসিলেন]

—জিভ্‌টা বার কর তো—তোমার জিভে মন্ত্র লিখে দি—

[সারদা জিভ বাহির করিলেন রামকৃষ্ণ সারদার জিভে একাক্ষরা মাতৃমন্ত্র লিখিয়া দিলেন। সারদা

গলবস্ত্রে রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। রামকৃষ্ণ গঙ্গাজলে হাত ধুইলেন। সারদাকে পিছনের দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ তুমি নহবৎ ঘরে মার কাছে চলে যাও। কে যেন বাইরে অপেক্ষা করছে, দেখা করতে চায়।

[সারদা পেছনের দরজা দিয়া চলিয়া যান। রামকৃষ্ণ অপর দরজা খুলিয়া দেখেন নরেন্দ্রনাথ চিন্তিত মনে দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন]

—কি রে! তুই কখন এলি?

নরেন ॥ এসেছি অনেকক্ষণ। মনটা কিছুতেই স্থির করতে পারছি না—তাই ছুটে এলাম।

রামকৃষ্ণ ॥ (হাসিয়া) ও! বুঝেছি। তা বেশ করেছিস, বেশ করেছিস—আয় বোস।

নরেন ॥ না। বসবো না। সংসারের দুঃখে কষ্টে জ্বলে পুড়ে মরছি। বসে উপদেশ তোমার অনেক শুনেছি। ওতে কোন লাভ নেই। আমার জন্যে তুমি কি করতে পার বল?

রামকৃষ্ণ ॥ আমি আর কি করবো? সংসারের দুঃখু কষ্ট ঘোচাবার ক্ষমতা আমার নেই। মাকে বলে দেখ, মা যদি তোর দুঃখু কষ্ট ঘোচাতে পারে।

নরেন ॥ কেন? তুমি তো মার সঙ্গে কথা কও—তাঁর সঙ্গে দেখা হয়—আমার হয়ে মাকে তুমিও তো কথাটা বলতে পার। বাবা মারা গেলেন, পৈতৃক ভিটেটুকু পর্য্যন্ত আত্মীয়রা দখল করে নিল। মাসে আয় ত্রিশ টাকা। মাথার ওপর বৃহৎ সংসার। তার ওপর এক কাঁড়ি পিতৃ-ঋণ চেপে বসে আছে। সংসারের বড় আমি। অথচ কিছুই করতে পারছি না—

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ্, আমি তোর হয়ে মাকে বলতে পারি। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানিস্—আমি মার কাছে কথা দিয়েছি—ওসব জিনিষ আর চাইবো না। মা বলেছে—যার অভাব সে এসে চাক। তার চেয়ে আমি বলি কি, আজ মঙ্গলবার, তুই বরং নিজে মার কাছে চলে যা—এই আমার কাছে এসে যেমন তোর দুঃখু কষ্টের কথা বল্লি, ঠিক তেম্‌নি করে মাকেও বল্‌বি—তারপর তুই যা চাইবি—তাই পাবি। যা—

[রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে সস্নেহে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতে যাইবেন এমন সময় মত্ত অবস্থায় গিরিশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বলিলেন]

নরেন ॥ একি! ঠাকুরের কাছে আপনি মদ খেয়ে এসেছেন!

রামকৃষ্ণ ॥ তাতে কি হয়েছে? ও মনের জ্বালায় মদ খেয়েছে। ওর আর এক রকমের জ্বালা।

গিরিশ ॥ ঠিক তাই। বড় জ্বালায় জ্বলছি বাবা! তাই তো রাতের বেলায় ছুটে এলাম।

রামকৃষ্ণ ॥ তা বুঝেছি। ওরে শালা, তুই কি ভেবেছিস তোকে ঢেম্‌না সাপে ধরেছে, যে তুই পালিয়ে যাবি? এ জাত সাপ—তিন ডাক ডেকেই চুপ করতে হবে।

গিরিশ ॥ কিন্তু এ জাত সাপের জ্বলুনির ওষুধ কি?

রামকৃষ্ণ ॥ বলেছি তো—মনের পাপ ঘুচিয়ে বিশ্বাস কর। ঠাকুরের নাম কর।

গিরিশ ॥ বিশ্বাস হয় কিসে?

রামকৃষ্ণ ॥ একাগ্রতা, নিষ্ঠা।

গিরিশ ॥ ও দুটোরই আমার বড় অভাব।

রামকৃষ্ণ ॥ তা হলে ঠাকুরকে স্মরণ কর।

গিরিশ ॥ সারাদিন পাঁচ কাজে ঘুরে বেড়াই—ও মনেও থাকবে না —পারবোও না।

রামকৃষ্ণ ॥ তা হোলে অন্ততঃ রাত্তিরে শোবার সময় একবার করে ঠাকুরকে স্মরণ করবি।

গিরিশ ॥ চেষ্টা করবো—তবে কথা দিতে পারি না।

রামকৃষ্ণ ॥ কেন রে? শোবার সময় একবার নাম নিবি, এতে আর চেষ্টার কি আছে?

গিরিশ ॥ সত্যি কথা বলতে কি বাবা! রাত্রে কোথায় থাকি, কি অবস্থায় থাকি, তার ঠিক নেই। এ অবস্থায় শুধু শুধু বাজে কথা বলে লাভ কি?

রামকৃষ্ণ ॥ তবে দে শালা, তোর বকল্‌মা দে—আমিই তোর হোয়ে ডাক্‌বো।

গিরিশ ॥ তুমি ডাকলে বিশ্বাস হবে? মনের বাঁক যাবে?

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ্‌ না শালা কি হয়—

গিরিশ ॥ ঠিক আছে। দেখি, কি হয়।

[গিরিশ টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেলেন।
রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ আয়—

[নরেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

সপ্তম দৃশ্য

[তখন গভীর রাত্রি। মন্দিরের দরজা বন্ধ। অন্ধকারে মন্দির চত্বরে রামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথকে দেখা যায়]

রামকৃষ্ণ ॥ যা না, যা—ভয় কি ?

নরেন ॥ আমার একা যেতে ভয় করছে, তুমিও চলো।

রামকৃষ্ণ ॥ আরে মায়ে ব্যাটায় কথা—তার ভেতরে তৃতীয় ব্যক্তির থাকতে নেই—তুই যা না, যা—আমার কাছে যেমন করে দুঃখু কষ্টের কথা বল্লি—তেমনি করে বলগে যা—

[রামকৃষ্ণের কথায় নরেন্দ্রনাথ দু-এক পদ অগ্রসর হইলেন। রামকৃষ্ণ আড়ে আড়ে সেদিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ দু-এক পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ কি রে! কি হোল ? ফিরে এলি কেন ?

নরেন ॥ না—দরকার নেই—তোমার ভেল্কীতে একদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম—আবার যদি তেমনতর হোয়ে পড়ি—যা চাইবো বলে যাচ্ছি, তা চাইতে যদি ভুলে যাই—

রামকৃষ্ণ ॥ আরে না না—ভুলবি কেন ? যা—

[ঠাকুর এক প্রকার জোর করিয়া নরেন্দ্রনাথকে মন্দিরের দ্বারে আগাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র মন্দিরের দরজা খুলিলেন।

মা ভবতারিণীর সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। সুপ্রসন্না মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদীপের উজ্জ্বল

শিখায় উদ্ভাসিতা। নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মায়ের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর প্রণাম করিয়া বলেন]

নরেন॥ না না, ঘৃণায় মন ভরে উঠেছে—সাংসারিক দুঃখু কষ্ট অনটনের কথা এসব আমি তোমায় কিছুই বলতে পারব না। মাগো! তোমার কাছে শুধু আমি এই প্রার্থনাই করছি—বিবেক দাও—ভক্তি দাও—বৈরাগ্য দাও—এমনি করেই তোমায় যেন আমি যখন তখন দেখতে পাই মা! যখন তখন দেখ্‌তে পাই—

[বিশ্বের বরদাত্রী আদ্যাশক্তির দেহ হইতে অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই আলোকের বন্যায় নরেন্দ্রনাথ চেতনা হারাইলেন। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন]

নরেন॥ কে? কে তুমি? কোন্ কর্ণধার তুমি, আলোর তরী বেয়ে নিয়ে এলে—কি সুন্দর! কি অপরূপ! কি মনোহর! বিবেক দাও—বৈরাগ্য দাও—ভক্তির বন্যায় আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলো—

রামকৃষ্ণ॥ তাই হবে রে—তাই হবে—মার কাছে যা চেয়েছিস্, তাই হবে।

অষ্টম দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুরের ঘর। দেবেন, সুরেন, রাখাল, যোগীন প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া আছেন। ভিজা গামছা হাতে জামায় বোতাম দিতে দিতে মহেন্দ্র গুপ্ত অর্থাৎ মাষ্টার মশাই প্রবেশ করিয়া বলেন]

মাষ্টার ॥ আজ কি ব্যাপার হয়েছে জান দেবেন ?

দেবেন ॥ কি মাষ্টার মশাই ?

মাষ্টার ॥ ঠাকুরের মা মারা গেলে, ঠাকুর ত তাঁর শ্রাদ্ধ শান্তি কিছুই করতে পারেন নি—

দেবেন ॥ তা ত জানি। ঠাকুরের ভাইপো রামলালই শ্রাদ্ধ শান্তি করেছিল—

মাষ্টার ॥ তাই ঠাকুরের আজ ইচ্ছে হয়েছিল, মাতৃ-তর্পণ করার। গঙ্গায় স্নান করতে নেবে অঞ্জলি ভরে যত বার জল নেন, ততবারই আঙ্গুলের পাশ দিয়ে সে জল গড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত তর্পণ করা হোল না! বললেন—'মায়ের কোন কাজই করতে পারলাম না রে—'

দেবেন ॥ আহা !

মাষ্টার ॥ গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠ্‌ছিলেন বললেন, আর একটা ডুব দি— বললাম, এই ত কত ডুব দিলেন। বললেন—'গিরিশের জন্যে আর একটা ডুব দি'—

দেবেন ॥ গিরিশ সত্যিই ভাগ্যবান! বেশ আছে কিন্তু—দিব্যি নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে—

সুরেন ॥ তা যা বলেছো দেবেন, আর বাবা বয়ে বেড়াচ্ছেন—ওর, বকল্‌মা।

মাষ্টার ॥ তা নেচে কুঁদে বেড়াক, আর যাই করুক সুরেন, গিরিশের বিশ্বাসের বহর দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি !

রাখাল ॥ কি রকম ?

মাষ্টার ॥ বলে কি জান রাখাল? ঠাকুর অবতার! মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন। আর আমার মত পাপীকে উদ্ধার করতে ঠাকুর আমার বকল্‌মা নিয়েছেন।

দেবেন ॥ গিরিশ আমাকেও সেদিন ঠিক ঐ কথাই বলেছে। ঠাকুরের ওপর এত বিশ্বাস, অথচ দেখুন, স্মরণ-মননের বালাই নেই।

মাষ্টার ॥ ওর তার প্রয়োজনই বা কি? যা কিছু করার, ওর হোয়ে ঠাকুরই ত তা করছেন। গুরুর পায়ে সর্ব্বস্ব নিবেদন করে গিরিশের এই আত্ম-সমর্পণ সত্যই বিস্ময়কর!

দেবেন ॥ জানেন মাষ্টার মশাই, সেদিন কথায় কথায় গিরিশকে বললাম—'আর কেন? মদ-টদ্‌গুলো ছাড়ো এবার।' বললে—'ছাড়াতে হয়, ঠাকুর ছাড়বেন। গেলাতে হয়, ঠাকুর গেলাবেন। চাবুক মেরে ছোটাতে হয়, তিনিই ছোটাবেন। রাস টেনে থামাতে হয়, তিনিই থামাবেন।'

যোগীন ॥ যাই বলুন, লোকটা মদ খেয়ে যখন ঠাকুরের কাছে আসে, তখন সত্যিই খুব খারাপ লাগে—

মাষ্টার ॥ তোমার আমার খারাপ লাগায় কি আসে যায় যোগীন? ঠাকুর গিরিশের ঐ মত্ত ভাবটুকুই পছন্দ করেন। বলেন, ও ভৈরব! ও সুরভক্ত! বীরভক্ত! গিরিশের ভক্তি আছে, আচার নেই—এদেরই তো তুলে ধরার দরকার যোগীন—

[সহসা মত্ত অবস্থায় গিরিশ প্রবেশ করেন ও মাষ্টার মশাইকে হাত তুলে নমস্কার করে বলেন]

গিরিশ ॥ এ কি! সকালেই যে চাঁদের হাট বাজার! ব্যাপার কি?

মাষ্টার ॥ ব্যাপার আর কি। এলাম ঠাকুরের কাছে।

গিরিশ ॥ তা বুঝেছি। জ্বালা পোড়া ধরেছে! নরেন কোথা? তাকে দেখছি না যে?

দেবেন ॥ নরেন গঙ্গাস্নান করতে গেছে—

গিরিশ ॥ বল কি! ইংরেজী লেখাপড়া ইয়ং বেঙ্গল—গঙ্গায় ডুব দিতে গেল!

দেবেন ॥ হ্যাঁ। আজকে যে গঙ্গাস্নানের যোগ রয়েছে।

গিরিশ ॥ ও! তাই বলো? সেই জন্যে তোমরা সবাই এসে হাজির হয়েছ?

[সহসা নরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন]

নরেন ॥ এই যে জি-সি? কতক্ষণ?

গিরিশ ॥ এই ত আসছি। গঙ্গায় ডুব দিয়ে এলে?

নরেন ॥ হ্যাঁ। তা আপনিও যান না? একটা ডুব দিয়ে আসুন—

গিরিশ ॥ না বাবা! ওতে আমি নেই। নেশায় হাবুডুবু খাচ্ছি। ডুব দিয়ে নেশা কেটে যাক আর কি!

[সহসা রামকৃষ্ণ প্রবেশ করেন। তাঁহার পিছনে পিছনে লাটুও আসে]

রামকৃষ্ণ ॥ কি রে! গিরিশ এসেছিস্?

[গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন। পরে উঠিয়া বলেন]

গিরিশ ॥ দেখ না বাবা! নরেন আমায় গঙ্গায় ডুব দিতে বল্‌ছে—

রামকৃষ্ণ ॥ তা যা না, দিয়ে আয় না একটা ডুব। আজ স্নানের যোগ রয়েছে, এরা সব ডুব দিয়ে এলো—

গিরিশ ॥ তা দিক্। আমি দেব না।

রামকৃষ্ণ ॥ কেন রে?

গিরিশ ॥ নেশা কেটে যাবে।

রামকৃষ্ণ ॥ সে কি রে শালা! নেশা কেটে যাবে বলে, গঙ্গায় ডুব দিবি না? লোকে কথায় বলে, 'শতেক যোজনে থাকি, যদি গঙ্গা বলে ডাকি'—দোরের গোড়ায় গঙ্গা—ডুব দিবি না কি বল্?

গিরিশ ॥ যারা গঙ্গায় ডুব দেবে, তারা দোরের কাছে থাকলেও দেবে —আর দশ ক্রোশ হেঁটে গিয়েও ডুব দেবে। আর যারা দেবে না—দশ ক্রোশ কেন—দোরের গোড়ায় থাকলেও দেবে না।

নরেন ॥ আহা! ঠাকুর যখন বলছেন, যান না, একটা ডুব দিয়েই আসুন না?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—যা। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আয়।

গিরিশ ॥ নাঃ! আজ তোমরা আমায় গঙ্গায় না নাইয়ে আর ছাড়বে না দেখছি।

[অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিরিশ গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে বাহির হইয়া গেলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ লাটু, যা রে তেল গামছা দিয়ে আয়—

[লাটু প্রস্থান করে। রামকৃষ্ণ হাসিতে থাকেন]

রামকৃষ্ণ ॥ শালা বলে কি না, নেশা কেটে যাবে। জানিস্ নরেন, শালা মদ খেলে কি হবে? আসলে কিন্তু মদ মাতাল নয়—ও মন মাতাল!

[শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিলেন]

সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে—
(আমার) মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে,
প্রসাদ বলে, এমন সুধা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

ওরে খোলোস দেখে সাপ চেনা যায় না রে—খোলস দেখে সাপ চেনা যায় না—

মহেন্দ্র ॥ তা ঠিক। বাইরেটা ওর যাই হোক, ভেতরটা কিন্তু বড় পরিষ্কার।

[এই কথার মাঝে গিরিশচন্দ্র স্নান না করিয়া যথারীতি ফিরিয়া আসিলেন। এখন কেবলমাত্র গায়ের জামাটি কাঁধে ফেলা। গিরিশ দু হাতে অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গাজল আনিয়াছেন।

লাটুও তেলের শিশি ও গামছা লইয়া তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসে। গিরিশকে দেখিয়া রামকৃষ্ণ বলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ কি রে, স্নান করিস্ নি ?

গিরিশ ॥ না।

রামকৃষ্ণ ॥ স্নান না করেই চলে এলি ?

গিরিশ ॥ হ্যাঁ।

রামকৃষ্ণ ॥ সে কি রে, শালা ! গঙ্গার তীরে গিয়ে ফিরে এলি ?

গিরিশ ॥ হ্যাঁ, ভেবে দেখলাম—আমার অত পাপ মা গঙ্গার ধারণেরও ক্ষমতা নেই ! তাই অঞ্জলি ভরে জল এনেছি তোমার পায়ে দিতে—পতিতপাবন তুমি, যা করাবে তাই হবে।

[গিরিশচন্দ্র অঞ্জলি ভরা জল শ্রীরামকৃষ্ণের পাদ-পদ্মে দিলেন। রামকৃষ্ণ চম্‌কাইয়া উঠিলেন। গিরিশ রামকৃষ্ণের ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহার এই কাজটি যে অন্যায় হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি-লেন। রামকৃষ্ণের পদতলে পড়িয়া কহিলেন]

—ঠাকুর, আমি তোমার অধম সন্তান। কত ভক্ত তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য হয়। আর আমি কিনা তোমার চরণে পাপ অঞ্জলি দিলাম। আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর—আমায় ক্ষমা কর।

[রামকৃষ্ণ গিরিশকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইলেন ও বলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ তুই দিলি কি রে ? তুই না আমায় 'বকল্‌মা' দিয়েছিস্ —ও পাপ তো আমি স্বেচ্ছায় নিলাম, নীলকণ্ঠ হবো বলে।

[পর্দা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কাশীপুরের বাগনবাড়ী। ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে মাষ্টার মশাই, দেবেন, সুরেন, রাখাল, যোগীন ও আরো কয়েকজন বসিয়া আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন]

মাষ্টার॥ লোকে যে যাই বলুক না কেন, সত্যিই দেবেন, তোমার বন্ধুটি এক অসাধারণ ব্যক্তি।

দেবেন॥ ঠিকই বলেছেন মাষ্টার মশাই। গিরিশ সত্যই সাধারণ মানুষের ব্যতিক্রম। যখন যা করেছে, চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস ভক্তি কোনদিন ছিল না, আর আজ তার এই পরিবর্ত্তন দেখে, আমি বিস্মিত হয়ে গেছি!

মাষ্টার॥ ঠাকুর অসুস্থ শরীরে গলার ব্যথা নিয়ে পানিহাটীর মহোৎসবে গেলেন—তারপর থেকেই গলার অসুখে ভুগছেন, গিরিশের দৃঢ় ধারণা, তার পাপ গলায় ধারণ করে ঠাকুর "নীলকণ্ঠ" হোয়েছেন। কথায় কথায় সেদিন কি বল্লে জান? বল্লে—ঠাকুর অবতার—মানুষকে উদ্ধার করতে, সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় ঘটাতে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

দেবেন॥ ঠাকুর একদিন বলেছিলেন—তোরা দেখিস্, ওর বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে পাওয়া যাবে না।

লাটু॥ আরে ঠাকুরের কোথা ত ঠিকই মিলে গেলো। গিরিশ-বাবু কো ঠাকুরের উপর বহুৎ বিশ্ওয়াস্ আছে।

যোগীন ॥ বাপ্ রে বাপ। কাল ঠাকুরের কথায় ওর কাছে বাতি চাইতে গিয়ে ত আমি ভয়ে মরি! দেখে মনে হোল, এই বুঝি দেয় দু-ঘা বসিয়ে—মদ টেনে চুরচুরে মাতাল! দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে যত টিপ্ টিপ্ করে প্রণাম করে, তত গালাগালি দেয়—

সুরেন ॥ গালাগালি দিতে লাগলো, কেন ?

যোগীন ॥ কেন আবার? মাতালের খেয়াল! ঠাকুরকে এসে বল্লাম—ঠাকুর বল্লেন—'তুই শুধু ওর গালাগালিটাই দেখ্লি, আর প্রণামটা দেখতে পেলিনে ?'

মাষ্টার ॥ ঠাকুর শ্যামপুকুর থেকে চলে আসার পর, ও আর একদিনও এ-মুখো হয় নি। গিরিশের ধারণা, ওর পাপেই ঠাকুর এই রোগ ভোগ করছেন—ঠাকুর শুনে হাসতে লাগলেন। নরেনকে বলেছেন, আজ ধরে নিয়ে আসার জন্যে—আমরা সবাই তো হার মেনে গেলাম, কেউ তাকে ধরে আনতে পারলাম না। দেখা যাক্, নরেন কি করে—

রাখাল ॥ ঠাকুরের যখন তার সঙ্গে দেখা করার বাসনা হয়েছে, তখন আজ তাকে আসতেই হবে মাষ্টার মশাই—

মাষ্টার ॥ বলা যায় না রাখাল, হয়ত নাও আসতে পারে। ঠাকুরের পায়ে পাপ অঞ্জলি দেওয়ার পর, ওর মনে যে ক্ষোভ ছিল—শ্যামপুকুরে কালীপূজার দিন ঠাকুরকে পূজো করে, ও তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

[সহসা নরেনের সহিত গিরিশ প্রবেশ করেন।
মাষ্টার মশাই বলেন]

—এই যে! এসো গিরিশ। এই তোমার কথাই এতক্ষণ আমরা বলাবলি করছিলাম। চলো, ঠাকুর ক'দিনই তোমার নাম করছেন। চলো ঠাকুরের কাছে।

গিরিশ ॥ নরেনের মুখে সব কথাই শুনেছি মাষ্টার! ঠাকুর যখন

অনুগ্রহ করে স্মরণ করেছেন, তখন আজ আর এমনি যাব না। আজ শুচিশুদ্ধ হয়ে যাব। তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি গঙ্গা স্পর্শ করে আসি—

[প্রস্থানোদ্যত]

মাষ্টার ॥ [বাধা দিয়া] না না, তোমায় কিছুই করতে হবে না। ঠাকুরের কৃপায় চিরশুচী, চিরশুদ্ধ তুমি !

গিরিশ ॥ ও কথা বলো না মাষ্টার—গঙ্গা স্পর্শ না করে ঠাকুরের চরণ আজ আর কিছুতেই স্পর্শ করতে পারব না, কিছুতেই পারব না।

[গিরিশ বাহির হইয়া গেলেন। সকলে সবিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাশীপুর উদ্যানবাটী। ঠাকুরের ঘর। ঠাকুর শয্যায় শুইয়া আছেন—পাশে সারদামণি শুশ্রূষায় নিযুক্তা]

রামকৃষ্ণ ॥ অত ভাব্ছ কেনে গো !

সারদা ॥ কৈ না ত !

রামকৃষ্ণ ॥ ভাবছ বৈ কি ! কালীপূজোর দিন শ্যামপুকুরে ছেলেরা আমায় যেদিন পূজো করলো—সেইদিন থেকেই দেখছি, তোমাকে যেন ভয় ভাবনায় পেয়ে বসেছে।

সারদা ॥ সত্যিই তাই। তুমি যে একদিন বলেছিলে—যেদিন দেখবে, ভক্তরা আমায় পূজো করছে, সেইদিনই জানবে দেহের লয় হোতে আমার আর বাকী নেই। (আঁচলে চোখ মুছিলেন)

রামকৃষ্ণ ॥ তার জন্যে ভাবনা কি গো! মনে রেখো—তুমি আর আমি অভেদ। আমি না থাকি, তুমি থাকবে। আর তোমার মধ্যেই—আমি বেঁচে থাকবো। আর ছেলেদের মধ্যে তুমি মা হোয়ে থাকবে। দেহটা তো আর চিরকাল থাকে না গো! থাকে তার কর্ম্মফল! মনে রেখো, মানুষ বেঁচে থাকে—তার কাজের মধ্যে, গুরু বেঁচে থাকেন, তাঁর শিষ্যের মধ্যে, আর ভগবান বেঁচে থাকেন, তাঁর ভক্তের মধ্যে।

[ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ গিরিশকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাটু ও অন্যান্য ভক্তরাও আসেন। সারদামণি ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যান। রামকৃষ্ণ বলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ লাটু পিক্‌দানিটা একটু দে তো—

লাটু ॥ এ্যাঁ! ফির্ ধোমি ক্যরবেন ঠাকুর ?

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে না না, ভয় নেই, আর বমি করবো না, তুই গিরিশকে ওটা দেখা—

[লাটু পিক্‌দানিটা হাতে করিতেই রামকৃষ্ণ বলিলেন]

পিক্‌দানিটার দিকে ভাল কোরে চেয়ে দেখ্ তো গিরিশ—

গিরিশ ॥ (দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন) এ কি! এ যে রক্ত!

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ রক্ত, তুই যে লোকের কাছে আমাকে অবতার বলে বেড়াস্—অবতারের কি এই লক্ষণ রে ?

গিরিশ ॥ হ্যাঁ। এই লক্ষণ। এবার উদ্ধার হোতে কেউ বাকী

থাকবে না। তোমার ক্ষতের পুঁজ রক্ত খেয়ে, এবার পোকা মাকড়, পিঁপ্‌ড়েটা পর্য্যন্ত উদ্ধার হোয়ে যাবে।

[গিরিশচন্দ্রের কথা শুনিয়া ঠাকুর অপরাপর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলিলেন]

রামকৃষ্ণ॥ ওরে দেখ্—দেখ্, গিরিশের বিশ্বাসের বহর দেখ্! একেই বলে— পাঁচ সিকে পাঁচ আনা!

গিরিশ॥ (ঠাকুরকে প্রণাম করে) রাম অবতারে, ধনুর্ব্বাণে জগৎজয় হয়েছিল—কৃষ্ণ অবতারে, বংশীধ্বনিতে জগৎজয় হয়েছিল—আর এবার প্রণাম অস্ত্রে জগৎজয় হবে। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!!!

[সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর ভক্তেরাও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন]

রামকৃষ্ণ॥ আচ্ছা, সেদিন যোগীন বাতি চাইতে গিয়েছিল—তার ওপর তুই অত রেগে গিয়েছিলি কেন বল্ তো?

যোগীন॥ শুধু রাগ। বল্‌বো কি বাবা—আর একটু হোলে দু ঘা বসিয়ে দিত আর কি—

গিরিশ॥ সে দিনের কথা বাদ দাও যোগীন—বুঝতেই তো পারছো—একটু রংএ ছিলাম।

রামকৃষ্ণ॥ মদ খেয়েছিলি বুঝি?

গিরিশ॥ হ্যাঁ। কিন্তু হলফ্ কোরে বলতে পারি বাবা, সেদিন আমার এতটুকুও নেশা হয় নি।

রামকৃষ্ণ॥ নেশা হয় নি তো তেড়ে এলি কেন যোগীনকে?

গিরিশ॥ হঠাৎ রাগ হোয়ে গেল। ও কি না কাশীপুর থেকে মাত্র একটা বাতির জন্যে গেছে আমার কাছে?

রামকৃষ্ণ ॥ ওর দোষ কি—আমি ওকে একটা বাতিই তো চাইতে পাঠিয়েছিলাম।

গিরিশ ॥ একটা বাতি! ও বুঝেছি, তোমার জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তুমি আমার চোখ ফুটিয়েছ। এখন যাবার সময় এই অন্ধকার পথে আলো জ্বেলে চলে যেতে চাও—কেমন? (গিরিশ কাঁদিয়া ফেলিলেন) বেশ, তো তাই যাও, তাই যাও। বাতিটা জ্বেলেই চলে যাও। তা যাবেই যখন, তখন আমায় আবার ডাকতে পাঠিয়েছ কেন?

[গিরিশের কথায় রামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিল]

রামকৃষ্ণ ॥ তোর সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে। দে যোগীন, ও শালার কাপড় চাদরটা এনে দে।

[যোগীন চলিয়া গেলেন]

গিরিশ ॥ কাপড়-চাদর?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ। সাদা নয়, গেরুয়া। রুদ্রাক্ষ—

গিরিশ ॥ গেরুয়া! রুদ্রাক্ষ! ও যে সন্ন্যাসীর প্রাপ্য!

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ। আমার ছয় ভক্তকে গেরুয়া দিলাম—তার মধ্যে তুইও আছিস। গেরুয়া তোকে পরতে হবে না। সন্ন্যাসীও সাজতে হবে না। যেমন সংসার করছিস, তেমনি করবি। থিয়েটার করবি, বই লিখবি, ওটা তুই ঘরে তুলে রেখে দিস্।

[ইতিমধ্যে যোগীন গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষ লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে তুলিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে সেই গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষ দিলেন। গিরিশচন্দ্র গেরুয়াটি মস্তকে ঠেকাইয়া নিজের লেখা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন]

গিরিশ ॥ দিতে স্নিগ্ধ পদ ছায়া—
ধরায় ধরেছ কায়া,

ঐক্যতান পচার সংসারে ;
মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুচে সন্ধ
বিশ্বাস সঞ্চরে।
ঠাকুর তোমায় প্রণাম ! তোমায় প্রণাম !!

[উপরোক্ত আবৃত্তির পর, গেরুয়া মস্তকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বার বার প্রণাম করিয়া অশ্রুসজল নেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণের জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বেলা গড়াইয়া গিয়া সন্ধ্যার কালো ছায়া নামিয়া আসিল। সকলে নীরব হইয়া আছেন, সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ কি দেখ্ছো মাষ্টার ?—সন্ধ্যে হোল—সন্ধ্যে হোল—

মাষ্টার ॥ আলো জ্বালুক !

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ জ্বালুক। গিরিশের বিশ্বাসের বাতি জ্বালুক। জ্বাল্ যোগীন, বিশ্বাসের বাতি জ্বাল্—জ্বলুক অনির্ব্বাণ সত্যের বাতি, জ্ঞানের বাতি, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের বাতি !

[শ্রীরামকৃষ্ণ নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। যোগীন মাষ্টারের দিকে চাহিলেন]

মাষ্টার ॥ বোধহয় সমাধিস্থ, নরেন, নাম কর—

নরেন ॥ জয় তারা—জয় কালী, জয় তারা—জয় কালী—

[সকলে সমস্বরে]

"জয় তারা, জয় কালী—"

[এই সময়ে মা সারদামণি এক গলা ঘোমটা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের কাছে

বসিলেন। ঠাকুরের চোখে মুখে গঙ্গাজল দিলেন। পরে জল খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু জল গড়াইয়া পড়িয়া গেল।]

নরেন ॥ এ কি মা? জলটুকুও গিল্‌তে পারলেন না যে!

সারদা ॥ না বাবা, আর বোধহয় পারবেনও না। এ সমাধি নয় বাবা, এ সমাধি নয়—মহাসমাধি!

[ভক্তগণ সমস্বরে]

ভক্তগণ ॥ এঁ্যা! মহাসমাধি! মহাসমাধি—

—মঞ্চ ঘুরিয়া গেল—

তৃতীয় দৃশ্য

[কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি মন্দির। সমাধিক্ষেত্রে ঠাকুরের বিরাট এক তৈল-চিত্র। মন্দিরে অনির্ব্বাণ দীপশিখা জ্বলিতেছে। আর তাহার সম্মুখে ভক্তগণের সহিত গিরিশের ছায়ামূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। গিরিশচন্দ্রকে বলিতে শোনা যায়।]

গিরিশ ॥ না-না, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আছেন। আমরা সংশয়াচ্ছন্ন! তাই ভাবছি—ঠাকুর নেই। ঘোচাতে হবে সংশয়, ঠাকুরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে হবে—চন্দ্র-সূর্য্যের মত। মনে রাখতে হবে, দেহের লয় হলেও —দেহীর লয় হয় না। একটা মুমূর্ষু জাতিকে উদ্ধার করতে ঠাকুর ধরায়

অবতীর্ণ হয়েছিলেন—তিনি অবতার ! গীতা যদি সত্য হয়, ঠাকুরও সত্য। সত্যের মৃত্যু নেই—সত্য চিরভাস্বর ! তাই ঠাকুরেরও মৃত্যু হতে পারে না —ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয়ী ! ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয়ী !! ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয়ী !!!

[গিরিশচন্দ্রের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনা গান গাহিতেছে]

= শেষ =

অবৈতনিক সম্প্রদায়ের প্রতি ঃ

প্রথম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃঃ ৩৬—যাত্রাভিনয়ে একটি মেয়ে আসিয়া খড়্গটি গ্রহণ করিবে। মঞ্চাভিনয়েও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্যের দৃশ্যান্তরের অংশটুকু, পৃঃ ৬৪—কৃষ্ণ-কালী মূর্ত্তি দেখান সম্ভব না হইলে রামকৃষ্ণ ব্যাকুলভাবে নিষ্ক্রান্ত হইবেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য, পৃঃ ৬৭—শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব যাত্রা ও মঞ্চাভিনয়ে স্বাভাবিকভাবে হইবে। অলৌকিক কিছু করার প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃঃ ৭৩—মঞ্চ ও যাত্রাভিনয়ে স্বাভাবিকভাবেই অভিনয় হইতে পারে। অলৌকিক কিছু করার প্রয়োজন নাই।

চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, পৃঃ ১০৫—ইচ্ছা করিলে এই দৃশ্যটি বাদ দিয়াই অভিনয় করা যাইতে পারে।